শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের

পণ্ডিতমশাই

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঃ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

পন্ডিতমশাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, এখন সে-সব কথা স্মরণ করিলেও, সে লজ্জায় দুঃখে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন দু'বছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষে করিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন মেয়েটিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয় ; কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই বিশেষ কোন কারণে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্বার বিবাহ দেয়।

কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্বিতা ছিল। সেও রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কণ্ঠীবদল-ক্রিয়া সম্পন্ন করে ; কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন। তবে ইনি কে, কোন্ গ্রামে বাড়ি, তাহা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না, কুঞ্জও না। তাহার মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কণ্ঠীবদল ব্যাপারটা সত্য, কিংবা শুধুই রটনা, তাহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না। এত কাণ্ড কুসুমের সাত বৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়। সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে এই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী,—তাহার দেহে রূপ ধরে না। যেমনই গুণ, তেমনই কর্মপটুতা, আবার লেখাপড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি তাহাকে বেমানান দেখাইত না।

এদিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে ; তাহার বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধুতি-চাদর এবং কুসুমকে পাঁচ ভরি সোনা ও একশ' ভরি রূপার অলঙ্কার দিতে স্বীকৃত। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা কুসুম সম্মত হয় ; কিন্তু কুসুম যে কথা কানেও তোলে না। কেন তাহা বলিতেছি ;—ইহাদের বাপ-মা নাই। ভাই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতেই কুসুম ব্রাহ্মণকন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্রে হর পণ্ডিতের পাঠশালে পড়িয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে। আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গীসাথী। তাই এসব প্রসঙ্গেও তাহার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্যসখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথির সিন্দুর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে ; ইহারা কেহ তাহার মকর-গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ। ছি ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এ গ্রামে দেখাইতে পারিবে !

কুঞ্জ কহিল, দিদি, রাজী হ। ধরতে গেলে বৃন্দাবনই তোর আসল বর।

কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, আসল নকল বুঝিনে দাদা ; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন ? একি কুকুর-বেরাল পেয়েছ যে, যা-ইচ্ছা হবে, তাই করবে ? এই বিয়ে, এই কণ্ঠীবদল ; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠীবদল ; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠীবদল ; যাও, ও-সব আমার সুমুখে তুল না। বাড়লের উনি আমার কেউ নয় ; আমার স্বামী মরেছে, আমি বিধবা।

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন থতমত খাইয়া যায়। তথাপি সে ভাবে, আর একরকম করিয়া। সে বড় দুঃখী। এই দু'খানি কুটীর এবং তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁঠালের বাগান ছাড়া আর তাহার কিছু নাই। অতএব নগদ এতগুলি টাকা এবং এত জোড়া ধুতি-চাদর তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কণ্ঠীবদল তাহাদের সমাজে 'চল' আছে, তাই তাহার মা, ও-কাজ করিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এত বড় সুযোগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছে না, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পায় না। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে ; তারপর এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজরানী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা ! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত ! এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামায় ঘুন্‌সি, মালা, চিরুনি, কৌটা, সিন্দুর, তেলের মসলা, শিশুদের জন্য ছোট-বড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সূচের কারুকার্য ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়। সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোনটির হাতে আনিয়া দেয়। ইহা দ্বারা কেমন করিয়া কুসুম মূলধন বজায় রাখিয়া সে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না—পারিবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে বৃন্দাবনের সহিত দেখা ; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটম্বকে মহাসমাদরে বাড়িতে ধরিয়া আনিল হাত-পা ধুইতে জল দিল এবং তামাক সাজিয়া খাতির করিল। দ্বিপ্রহরে তাহার মা নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন, এবং রৌদ্রে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া, হাত-পা ধুইয়া, মুড়ি-মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে সেই সব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষে কহিল, হাঁ, একটা গেরস্থ বটে ! বাগান, পুকুর, চাষবাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই—মা-লক্ষ্মী যেন উথলে পড়ছেন।

কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া, বৃন্দাবনের মা কি রাঁধিয়াছিলেন এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল, খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়। বলে, এত রোদ্দুরে বেরুলে মাথা ধরে অসুখ করবে।

কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাহলে দাদা বুঝি সারাদিন এই কর্মই করেছ ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ ?

তাহার দাদাও সহাস্যে জবাব দিল, কি করি বল বোন ! ছেড়ে না দিলে তো আর জোর করে আসতে পারিনে ?

কুসুম কহিল, তাহলে ও গাঁয়ে আর কোনদিন যেও না।

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না ; জিজ্ঞাসা করিল, যাব না ! কেন ?

পথে দেখা হলেই ত ধরে নিয়ে যাবে। তারা বড়লোক, তাদের ক্ষতি নেই ; কিন্তু আমাদের তাহলে ত চলবে না দাদা !

ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুণ্ণ হইল।

কুসুম তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা বলিনি দাদা—সে কথা বলিনি ; দু'একদিন আর কি লোকসান হবে। তা নয় ; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী ; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করে ?

কুঞ্জ জবাব দিল, আমি তাদের ঘরে ত যেচে যাইনি, কুসুম !

তা যাওনি বটে ; তবে ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা ?

তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস তারাও ত সব বড়লোক, তবে যাস কেন ?

কুসুম দাদার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, তাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই খেলা করি ; তা ছাড়া তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়। এখানে আমাদের লজ্জা নেই ; কিন্তু ওদের কথা আলাদা।

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, সেখানেও লজ্জা নেই। মা-লক্ষ্মী তাঁদের দয়া করেছেন, দু পয়সা আছে সত্য ; কিন্তু এতটুকু দেমাক অহঙ্কার নেই—সবাই যেন মাটির মানুষ। বৃন্দাবনের মা আমার হাত দুটি ধরে যেমন করে—

কথাটা শেষ হইল না, মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আবার সেই-সব পুরোনো কথা ! মায়ের নামে ওরা যে বদনাম দিয়েছে, দাদা বুঝি ভুলে বসে আছ !

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তারা একটা কথাও তোলেনি। বদলোকে হিংসে করে বদনাম দিয়েছিল।

কুসুম কহিল, তাই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল—কেমন ?

কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাবন বেচারীর একটুও দোষ ছিল না। বরং তার বাপের দোষ ছিল।

কুসুম একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিল, যার দোষই থাক দাদা—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি এক শ' বার সেই-সব কথা তুলে ? আমি পারিনে আর তর্ক করতে।

কুঞ্জ প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুষ্টস্বরেই বলিল, তুই ত তর্ক পারিস নে ; কিন্তু আমাকে যে সব দিক দেখতে হয় ! আজ আমি ম'লে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস ?

কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ গম্ভীর মুখে কহিতে লাগিল, আমি আমাদের মুরুব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেচি, তোর শাউড়ী নলডাঙ্গার বুড়ো বাবাজীর মত পর্যন্ত জেনে এসেছে। সবাই খুশী হয়ে মত দিয়েচে, তা জানিস ?

কুসুমের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে, জানি বৈ কি ! —বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কণ্ঠীবদলের কথা লইয়া, তাহাদের সমাজে আলোচনা চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানাজানি চলিতেছে,—এ সংবাদ তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল ; কিন্তু এ ভাব চাপা দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি খাবে দাদা ?

কুঞ্জ বোনের মনের ভাব বুঝিল, সেও মুখ ভারী করিয়া বলিল—কিছু না। আমার ক্ষিদে নেই।

কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাও সংবরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া তামাকটা নিংশেষ করিয়া হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ডাক দিল, কুসুম !

কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে সিলাই করিতে বসিয়াছিল—সাড়া দিল, কেন ?

বলি, রাত্তির হচ্ছে না ? রাঁধবি কখন ?

কুসুম তথা হইতে জবাব দিল, আজ আর রাঁধবো না।

কেন ? তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।

কুসুম চেঁচাইয়া বলিল, আমি এক শ' বার বকতে পারিনে।

বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চেঁচাইয়া বলিল, জ্বালাতন করিস নে কুসি ! অমনধারা করলে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাব, তা বলে দিচ্চি।

যাও—এক্ষুনি যাও। বাড়ির মধ্যে আমি হাড়ী-ডোমের মত, অমন করে হাঁকাহাঁকি করতে দেব না। ইচ্ছে হয় যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাও গে।

কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, পোড়ারমুখী, তুই ছোটবোন হয়ে বড়ভাইকে তাড়িয়ে দিস ?

কুসুম বলিল, দিই। বড় বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি ?

বোনের মুখের পানে চাহিয়া কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল, কিসে যা ইচ্ছে করলুম শুনি ?

কেন তবে আমাকে না বলে ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে ?

কেন—তাতে দোষ কি হয়েছে ?

কুসুম তীব্রভাবে বলিল, দোষ হয়েচে। ঢের দোষ হয়েচে। আমি মানা করে দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।

কুঞ্জ বড়ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, কহিল, তুই কি বড়বোন যে, আমাকে হুকুম করবি ? আমার ইচ্ছে হলেই সেখানে যাব।

কুসুম তেমনি জোর দিয়া বলিল, না, যাবে না। আমি শুনতে পেলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি দাদা !

এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, যদি যাই কি করবি তুই ?

কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আমাকে রাগিও না বলছি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বলছি।

কুঞ্জ শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর ভয়ে সরে যাব ? যদি না যাই, কি করতে পারিস তুই ?

কুসুম জবাব দিল না ; প্রদীপের আলোটা আরো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সিলাই করিতে বসিল।

আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে।' নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই ; কিন্তু আমি একটু জোরে কথা কইলেই—বলিয়া

কুঞ্জ থামিল ; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া হুঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া, গলার সুর আর এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, আমি যখন বড়, আমি যখন কর্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে। বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোর গলায় হাঁকিয়া কহিল, চাইনে আমি কারো কথা, এক শ' বার না-না শুনতে আমি চাইনে ! আমি যখন কর্তা—আমার যখন বাড়ি—তখন আমি যা বলব তাই—বলিয়া সে সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় বেঁকাইয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল।

কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল ; বলিল, বসে বসে কোঁদল করবে, না যাবে এখান থেকে ?

ছোটবোনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুমুখের বড়ভাইয়ের কর্তা সাজিবার শখ উড়িয়া গেল। তাহার গলা দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনিভাবে বলিল, দাদা, যাবে কি না ?

এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই ; চিঁচিঁ করিয়া বলিল, বললুম ত, তামাকটা সেজে নিয়েই যাচ্চি।

কুসুম হাত বাড়াইয়া, দাও আমাকে, বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিটখানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, হুঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্যাকরাদের দোকানে যাচ্চ ত ?

কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কুসুম সহজভাবে বলিল, তাই যাও। কিন্তু বেশী রাত কর না, আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না।

কুঞ্জ হুঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
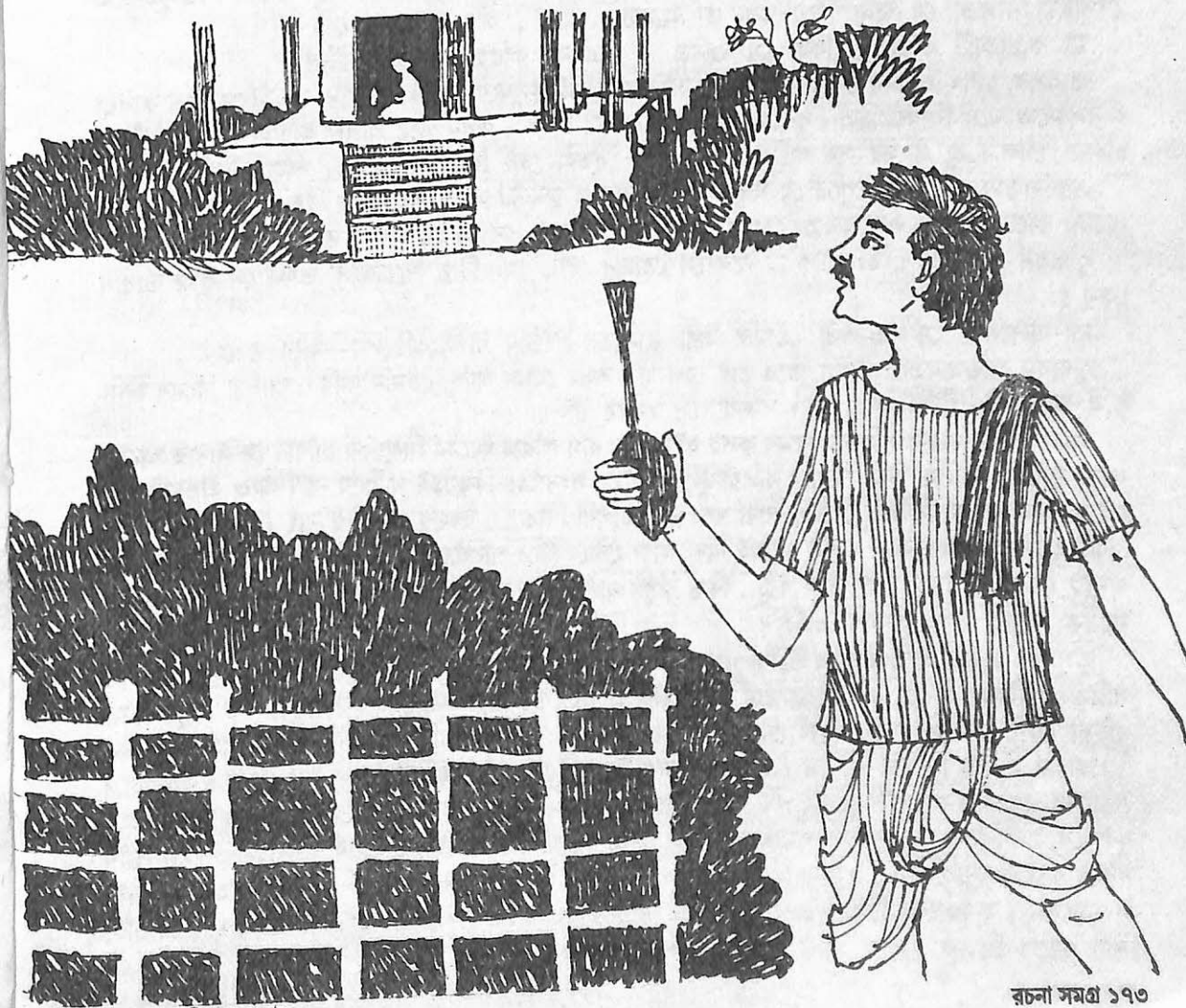
সেদিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যুক্তি মাত্র করে নাই। সত্যই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উথলিয়া পড়িতেছিল ; অথচ সেজন্য কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলেবেলায় নিজের চেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া শেখে এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন ; বৃন্দাবন একমাত্র সন্তান হইলেও এইসব অনাসৃষ্ট কার্যে পুত্রকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে সে নিজের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন ; তাই কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামে কেহই জানিতে পারে নাই—বেন্দা বোষ্টম ইংরাজী শিখিয়াছিল। বছর-পাঁচেক পূর্বে, স্ত্রীবিয়োগের পর, সে এই লেখাপড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত, সকালে গৃহকর্ম, বিষয়-আশয় দেখিত ; এবং দুপুরবেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত। বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, যে জন্য বিয়ে করা তা আমাদের আছে ; আর আবশ্যক নেই মা।

মা কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না। এমনই করিয়া বছর-দুই-কাটিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ির সম্মুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম নদী হইতে স্নান করিয়া কলসকক্ষে ঘরে ফিরিতেছিল ; বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল ; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ গ্রামের সব বাড়িই সে চিনিত ; সুতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিল।

এক সন্তান হইলে মাতাপুত্রে যে সম্বন্ধ হয়, বৃন্দাবন ও জননীর মধ্যে সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, সে কি হয় বাবা ? তাদের যে দোষ আছে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, তা হউক মা, তবু সে তোমার বৌ। যখন বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে কথা ভাবনি কেন ?

মা বলিলেন, সে-সব কথা তোমার বাবা জানতেন। তিনি যা বুঝেছিলেন—করে গেছেন।

বৃন্দাবন অভিমানভরে কহিল, তবে তাই ভাল মা। আমি যেমন আছি, তেমনি থাকি ; আমার বিয়ের জন্য তুমি আর পীড়াপীড়ি করো না। বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কাল সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিন্দুকের চাবিটা সে দাদার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সরোষে বলিয়াছিল, আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবে না। আজ প্রভাতে নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া দেখিল, দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামাটিও নাই। কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েচে। কল্যকার ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্যই সে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে। কিন্তু কুসুম যাহা অনুমান করিল তাহা নহে, সে ত্রুটি আর একটা। খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহকর্ম করিতে হইত। ঘর-দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া জল আনিয়া, তবে দাদার জন্য রাঁধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ ভাত খাইয়া ফেরি করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা-আহ্নিকে বসিত। যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছ, গোটাকয়েক মল্লিকা ও যুঁই-এর ঝাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিত্যপূজার ফুল যোগান দিত। ফুল তুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া সবেমাত্র পূজায় বসিয়াছে—এমন সময় সদরে কয়েকখানা গোযান আসিয়া থামিল এবং পরক্ষণেই একটি প্রৌঢ়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইহাকে আর কখনও দেখে নাই, কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, যেই হ'ন, স্বজাতি।

প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, তুমি আমাকে চেন না মা, তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কৈ ?

কুসুম জবাব দিল, তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরতে বোধকরি দেরি হবে।

আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, দেরি হবে কি গো ! কাল সে তার ভগিনীপতিকে, আরো চার-পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগনে হয়—সবাইকে খেতে বলে এলো—আমিও তাই আজ সকালে বললুম, বৃন্দাবন, গরুর গাড়িটা ঠিক করে আনতে বলে দে বাছা ; যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্বাদ করে আসি।

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম বুঝিল ইনি শাশুড়ী। তিনি আসনে বসিয়া হাসিয়া বলিলেন, কাল খাওয়াদাওয়ার পর বৃন্দাবন তামাশা করে বললে—আমি এমনিই হতভাগা যে, কুঞ্জদা বড়ভাই-এর মত হয়েও, কোনদিন ডেকে এক ঘটি জল পর্যন্ত খেতে বললে না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে—কুঞ্জনাথ হাসতে হাসতে তাই সকলকে নেমন্তন্ন করে এল—তারা সবাই এল বলে।

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মত ছিলেন না—তাঁর বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল ; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বৌমা, কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু বলে যায়নি !

কুসুম ঘোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন, সে বলিয়াই গিয়াছে। তাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তবু ভালো, তার পর কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, ভয় হয়েছিল—আমার পাগলা ছেলেটা বুঝি সব ভুলে আছে ! তবে বোধ করি, সে কিছু কিনতে-টিনতে গেছে, এক্ষুণি এসে পড়বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির।

কুঞ্জদা, বলিয়া বৃন্দাবন একটা হাঁক দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল ; সঙ্গে তাহার আরও তিনটি ছেলে—ইহারই মামাতো ভাই।

তাহার মা বলিলেন, কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা, ঘরের ভিতর একটা সতরঞ্জি পেতে দাও বাছা—ওরা বসুক।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া, কলিকাটা হাতে লইয়া তামাক সাজিয়া আনিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, ও থাক। তামাক আমরা কেউ খাইনে।

কুসুম কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া এইবার রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ অকস্মাৎ একি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল ! ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিস বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে স্নানে যাইবার পূর্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে ; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ অপরাধ করার পরে, ছোটবোনকে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত যে, সচরাচর মানুষ দুষ্ট মনিবকেও এত করে না। যে বড়লোকদের ঘরে শুধু খাইয়া আসিবার অপরাধে কুসুম এত রাগ করিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায়—সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখ ফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস কুঞ্জ মনের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়া পলাইয়াছে এবং কিছুতেই সে রাত্রির পূর্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াই কুসুম আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সবচেয়ে বিপদ হইয়াছিল, যে সিন্দুকটির ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটিকয়েক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই ; অথচ হাতেও একটি পয়সা নাই।

এখন নিরুপায়ভাবে মিনিট-পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে ; বাস্তবিক সমস্ত দোষ ত তাহারই। কেন সে তাহার নির্বোধ নিরীহ ভাইটিকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এই-সব পরিহাস করিল ! উনি কে যে, দাদা ওঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে ?

এই তিন বৎসর কত ছলে, কত উপলক্ষে বৃন্দাবন এদিকে যাতায়াত করিয়াছে ; কত উপায়ে তাহাদের মন পাইবার চেষ্টা করিয়াছে ; কতদিন সকাল-সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে বাটীর সম্মুখের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে ; জানে বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে।

কুসুম কাঠের মূর্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী ; এখন একা সে কি উপায় করিবে ?

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া, ছেলেদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁর ছেলের চোখ ঘরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি রান্নাঘরের ভিতরে কুসুমের উপর পড়িল—চোখাচোখি হইল, মনে হইল, সে সঙ্কেতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের এক অংশের জন্য তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ড উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। সে বুঝিল, ইহা চোখের ভুল ; ইহা অসম্ভব।

দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপথে প্রস্থান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে—এ হইতেই পারে না। বৃন্দাবন অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল ; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখাচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানেই চাহিল। ঠিক তাই ! কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল।

ত্রস্তপদে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলে আমাকে ?

কুসুম তেমনই মৃদুকণ্ঠে বলিল, হুঁ।

বৃন্দাবন আরো একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

কুসুম একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, ভারী চাপা গলায় বলিল, জিজ্ঞেস কচ্চি তোমাকে, আমাদের মত দীন-দুঃখীকে জব্দ করে, তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরি বাড়বে ?

হঠাৎ এ কি অভিযোগ ! বৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম অধিকতর কঠোরভাবে বলিল, জান না, আমাদের কি করে দিন চলে ? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাশা করতে গেলে ? কেন এত লোক নিয়ে খেতে এলে ?

বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, এই নালিশের কি জবাব দিবে ; কিন্তু স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশী বিচলিত হয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, শেষে সহজ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কোথায় ?

কুসুম বলিল, জানিনে। আমাকে কোন কথা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।

বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে খেতে দেবার কিছু নেই নাকি ?

কিছু না ; সব ফুরিয়েচে, আমার হাতে টাকাও নাই।

বৃন্দাবন কহিল, এ-গাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমাকে একটা গামছা দাও—আমি, একেবারে স্নান করে ফিরে আসব। মা জিজ্ঞেস করলে বল আমি নাইতে গেছি। দাঁড়িয়ে থেক না—যাও।

কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গামছা আনিয়া হাতে দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে বাটী ফিরিবার সময় বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু-গদগদকণ্ঠে বলিলেন, বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বলতে পারিনে। সুখী হও মা! বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে একজোড়া সোনার বালা বহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

আজিকার সমস্ত আয়োজন কুসুম গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নির্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইহাতেই তাঁহার হৃদয় আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রূ-বধূতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হল না মা, পাগলা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাটীতে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজিও করিতেছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল; সেই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে বেদীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল এবং কিছু মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার মায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, অমন আবছায়ায় বসে কেন মা?

মা সস্নেহে বলিলেন, তা হোক। আয়, তুই আমার কাছে এসে একটু বস।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল।

তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোনোদিন সে ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল—যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্রহৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন, এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মা-মরা আমার এই এককোঁটা বংশধরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক-পা নড়তে পারিনে, তাই আজ মনে হচ্ছে বৃন্দাবন, আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বোঝা নিচে নামিয়েচে। তাকে শিগগির ঘরে আন বাছা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটি নিই—দিন-কতক কাশী-বৃন্দাবন করে বেড়াই।

আজ বৃন্দাবনের অন্তরের আশা ও বিশ্বাসের এমনি স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ হাস্যে কহিল, সে আসবে কেন মা?

মা নিঃসন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, আসবে বৈ কি! সে এলে তবে ত আমার ছুটি হবে। আমারই ভুল হয়েছে বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে যাইনি। আসবার সময় নিজের হাতের বালা দু'গাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলুম, বৌমা পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। তখন বুঝেছি, আমার মাথার ভার নেমে গেছে। তুই দেখিস দিকি, প্রথম যেদিন একটা ভাল দিন পাব, সেইদিনই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনব।

বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এসে তোমার বংশধরটিকে দেখবে ত?

মা মৎক্ষণাৎ বলিলেন, দেখবে বৈ কি! সে ভয় আমার নেই।

কেন নেই মা?

মা বলিলেন, আমি সোনা চিনি বৃন্দাবন। অবশ্য খাঁটি কিনা, এখন বলতে পারিনে, কিন্তু পেতল নয়, গিলটি নয়, এ কথা আমি নিশ্চয় বলে দিলুম। তা নইলে আমার সংসারে তাকে আনবার কথা তুলতুম না। হাঁ রে বৃন্দাবন, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা ক'ন?

কোনদিন নয় মা। তবে আজ বোধ করি বিপদে পড়েই,—বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া চুপ করিল।

মা একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনই। মানুষ বিপদে পড়লেই তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়েমানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায় নি, তোকেই জানিয়েচে।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী করা, বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, সে বেশ লোক, পাড়াসুদ্ধ নেমন্তন্ন করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল—তার পর যা হয় তা হোক।

বৃন্দাবনও নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, শুনলুম, বৌমাকে সে ভারী ভয় করে—বড় ভাই হয়েও ছোট ভাইটির মতই আছে। এক-একজন রাশভারী মানুষ আছে বৃন্দাবন, তাদের ভয় না করে থাকবার জো নেই—তা বয়সে বড়ই আর ছোটই হোক। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই, যে ভার দিলে ভার সইতে পারবে। তবেই ত আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া তখনি বলিয়া উঠিলেন, একটি দিনের দেখায় তাকে কি যে ভালবেসেচি, তা আমি তোকে মুখে বলতে পারব না—সারা সন্ধ্যেবেলাটা কেবল মনে হয়েছে, কতক্ষণে ঘরে নিয়ে আসব, আবার কতক্ষণে দেখব।

বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল, সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কুঞ্জদার কথা কি বলছিলে, মা?

মা বলিলেন, হাঁ, তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে তুই গোপালকে গাড়ি আনতে বলে দিস, আমি একবার নলডাঙ্গায় যাব। ওখানে গোকুল বৈরাগীর মেয়েকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখতে শুনতেও মন্দ না; তা ছাড়া—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, তা ছাড়া ঐ এক মেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয়-আশয় রেখে মরেচে, না মা?

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, সে কথা সত্যি বাছা। কুঞ্জর পক্ষে সবচেয়ে দরকার। নইলে বিয়ে করলেই ত হয় না, খেতে পরতে দেওয়া চাই। আর মেয়েটিই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কালো, কিন্তু মুখশ্রী আছে। যাই হোক, দেখি কাল কি করে আসতে পারি।

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, আমিও দিনক্ষণ দেখাই গে মা। তুমি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে ফিরবে না, সে নিশ্চয় জানি।
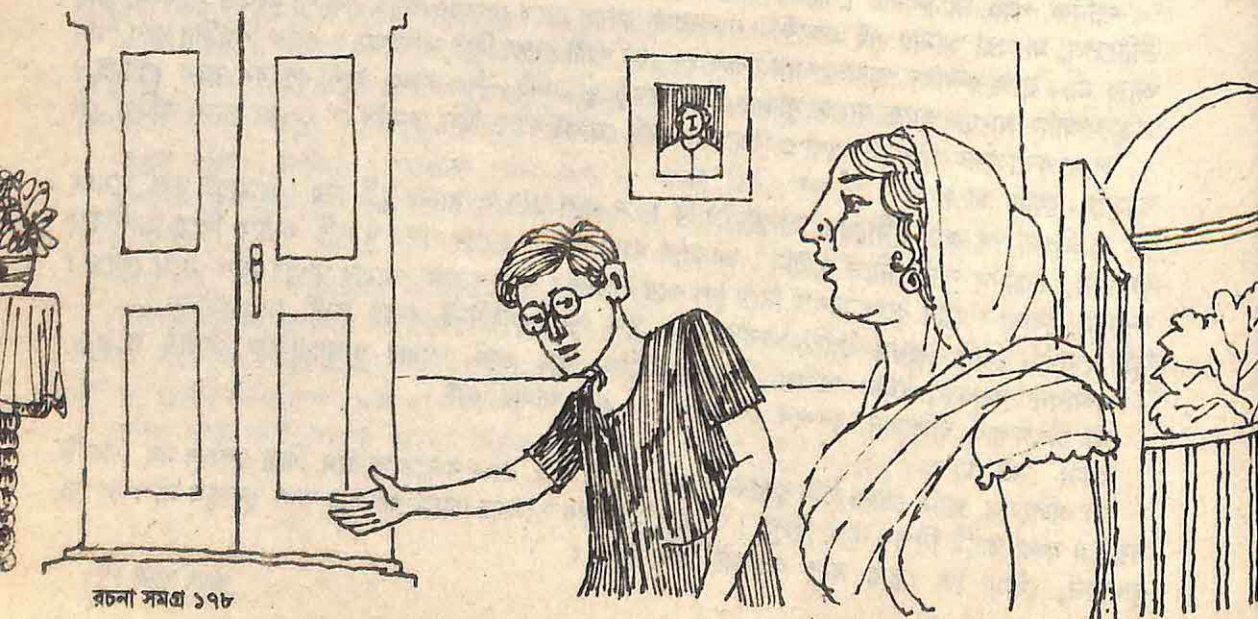
কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেনা-পাওনার কথা, খাওয়ান-দাওয়ানর কথা সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্নে বৃন্দাবনের জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

তখন চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নামতা আবৃত্তি করিতেছিল, বৃন্দাবন একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর গাড়ি সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিশুপুত্র চরণ গাড়ি হইতে নামিয়া চেঁচামেচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, মাতুলানী পছন্দ করিতে সেও আজ পিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, কবে দিন স্থির করে এলে মা?

এই মাসের শেষে আর দিন নেই, তুই ভিতরে আয়—অনেক কথা আছে ; বলিয়া তিনি হাসিমুখে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁর নিজের ঘরে বৌ আসিবে, এই আনন্দে তাঁর বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া, ঐ একটি দিনে ঘরকন্নার গৃহিণীপনায় কুসুমকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর-সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ-ধর্ম করিয়া বেড়াইবেন—এই সব সুখস্বপ্নের কাছে আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালের ছুটি দিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল, সেদিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল, উপোস করে ভাবলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পরের ভাবনা পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।

মা বলিলেন, সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে, তামাশা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকাকড়ি, না আছে লোকজন, আমাকেই সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখলুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক বাবা, তোমারই কথা হচ্ছিল, এস বস। হঠাৎ এ-সময়ে যে?

বাস্তবিক গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ি আসার এটা সময় নয়।

কুঞ্জনাথ বাড়ি ঢুকিয়া এ-রকমের সংবর্ধনা পাইয়া প্রথমটা থমমত খাইল। তারপর অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল, আচ্ছা কুঞ্জদা, টের পেলে কি করে? রাতটাও কি চুপ করে থাকতে পারলে না, না হয় কাল সকালে এসেই শুনতে?

মা একটু হাসিলেন। কুঞ্জ কিন্তু এদিক দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বোন নয় ত, যেন দারোগা!

বৃন্দাবন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল ; মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা কিছু বলে পাঠিয়েচেন বুঝি?

কুঞ্জ সে-প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা মা, তোমার এ কি-রকম ভুল ধর, কুসুমের চোখে না পড়ে যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা হলে কি সর্বনাশ হত বল ত!

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি কুঞ্জদা?

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া কুঞ্জ নিজেকে হালকা করিতে চাহিল না ; তাই বৃন্দাবনের প্রশ্ন কানেও তুলিল না। মাকে বলিল, আগে কি খাওয়াবে, তবে বলব।

মা এবার হাসিলেন ; বলিলেন, তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ি, কি খাবে বল?

কুঞ্জ কহিল, আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েচে আগে বল?

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া সন্দিগ্ধসুরে বলিলেন, কৈ কিছুই ত হারায় নি !

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হোহো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল পরে নিজে চাদরের মধ্যে হাত দিয়া একজোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, তাহলে এটা তোমাদের নয় বল ? বলিয়া মহা-আহ্লাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা, যাহা কাল এমনই সময়ে পরমস্নেহে স্বহস্তে তিনি পুত্রবধুর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্বাদ সে নির্বোধ কুঞ্জর হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন একমুহূর্ত সেদিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে একফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পান্ডুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের বুকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিমেষে সামলাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ ও শান্তভাবে বলিল, মা আমার বড় ভাগ্য , ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের মধ্যেই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতে বালা, সাধ্য কি মা যে সে পরে ? কুঞ্জদা, চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
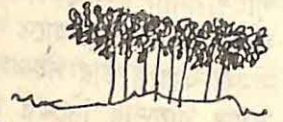
সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুঞ্জ বাড়ি ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের সুমুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কুসি, আলো জ্বালাস নি রে ?

কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই দিই দাদা। কখন এলে ?

এই ত আসচি, বলিয়া কুঞ্জ সন্ধান করিয়া হুঁকা-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল। তখনো প্রদীপ সাজানো হয় নাই, অতএব, সেই-সব প্রস্তুত করিয়া আলোজ্বালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল ; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লইয়া দাদা চলিয়া গিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ রাত্রেও ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গম্ভীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল,, একটি কথাও কহিল না। যে লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সহসা আজ এতবড় মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা কি, এবং কতদূর গিয়াছে ইহাই জানিবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, দাদাকে তাঁহারা অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোটখাটো অপমান তাহার দাদা ধরিতে পারে না এবং পারিলেও এতক্ষণ মনে রাখিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতেছিল, কুসুম আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে কার হাতে দিয়ে এলে দাদা ?

কুঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আবার কার হাতে, মার হাতে দিয়ে এলুম।

কি বললেন, তিনি ?

কিছু না, বলিয়া কুঞ্জ চলিয়া গেল।

পরদিন ফেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, তোর শাশুড়ীঠাকরুন কি এক-রকম যেন হয়ে গেছে কুসুম। অমন জিনিস হাতে দিয়ে এলুম, তা একটি কথা বললে না। বরং বৃন্দাবনকে ভাল বলতে হয়, সে খুশী হয়ে বলতে লাগল, সাধ্য কি মা, যে সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে ! আমার বড ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন—ও কি রে ?

কুসুমের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে পান্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না। এ কথা তিনি বললেন ?

হাঁ, সে-ই বললে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা ছাড়া তিনি কোথায় নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন, তখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি—এমন করে আমার পানে চেয়ে রইলেন যে, কি দিলুম, কি বললুম,, তা যেন বুঝতেই পারলেন না। বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া ধামা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন-চারিদিন গত হইয়াছে, রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া কুঞ্জ পরশু ও কাল মুখ ভার করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এইমাত্র ভাইবোনে তুমুল কলহ হইয়া গেল।

কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ পুড়ে যায়, ও পুড়ে যায়, আজকাল মন তোর কোথায় থাকে কুসী ?

কুসীও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল,, আমি কারো কেনা দাসী নই—পারব না রাঁধতে—যে ভাল রেঁধে দেবে তাকে আনো গে।

কুঞ্জর পেট জ্বলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না। হাত নাড়িয়া বলিল, তুই আগে দূর হ, তখন আনি কি না দেখিস। বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল।

সেইদিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এতবড় সুযোগ সে ত্যাগ করিল না।

দাদার অভুক্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমনি খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকান্না শুরু করিয়া দিল।

বেলা বোধ করি তখন দশটা, ঘন্টাখানেক কাঁদিয়া-কাটিয়া শ্রান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জদা' 'কুঞ্জদা' করিয়া ডাকিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া বছর-ছয়েকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু। কুসুম শশব্যস্তে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সুন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্রপথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এ যে তাহারই স্বামীর সন্তান, তাহা সে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু যেন সহস্র হইয়া উহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, তথাপি সে দিকে পা বাড়াইলনা। পাথরের মূর্তির মতো একভাবে পলকহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল।

আজ সকালে নিজের কাজে সে এইদিকে আসিয়াছিল এখন কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গোযান সজ্জিত দেখিয়া তাহার পুত্র 'চরণ' পূর্বাহ্ণেই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সে-ও সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল, কেউ বাড়ি নেই নাকি ?

তথাপি সাড়া নাই।

চরণ কহিল, জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া ধমক দিল, না, পায়নি, যাবার সময় নদীতে খাস।

সে বেচারা শুষ্কমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কুসুম লজ্জার প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের সুমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা অতি সহজে কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে বোধ করি কোনমতেই সুমুখে আসিত পারিত না। সে একবার একমুহূর্ত দ্বিধা করিল, তারপর একখানি ক্ষুদ্র আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া, কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতার ক্রোড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়া জানিত।

এদিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। একে ত এই মাত্র সে ধমক খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়াগায় হঠাৎ কোথা হইতে বাহির হইয়া এমন ছোঁ মারিয়া কোনদিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই।

কুসুম ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবলবেগে বুকের উপরে টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, ছি বাবা, আমি যে মা হই।

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোনমতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না। চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল ততই তাহার বঞ্চিত, তৃষিত মাতৃহৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তার নিজের ধন জোর করিয়া, অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু চরণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি নদীতেই জল খাইত। এই স্নেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধ করি অনেক সুস্থ হইতে পারিত। কহিল, ছেড়ে দাও।

কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, মা বল, তাহলে ছেড়ে দেব।

চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহলে ছেড়ে দেব না, বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া, চুমা খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল, মা না বললে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না।

চরণ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা।

ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাহির হইতে বৃন্দাবন কহিল, তোর জল খাওয়া হ'ল রে চরণ ?

চরণ কাঁদিয়া বলিল, ছেড়ে দেয় না যে।

কুসুম চোখ মুছিয়া ভাঙ্গাগলায় কহিল, আজ চরণ আমার কাছে থাক !

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, ও থাকতে পারবে কেন ? তা ছাড়া, এখনও খায়নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল, না, ও থাকবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

মন খারাপ কেন ?

কুসুম সে কথার উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, গাড়ি ফিরিয়ে দাও, বেলা হয়েচে, আমি নদী থেকে চরণকে স্নান করিয়ে আনি। বলিয়া আর কোনরূপ প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গামছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল।

বাটীর নীচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, জল দেখিয়া চরণ খুশী হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহাতে নামিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্বে ঘটে নাই। ঘাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল, এবং উপর হইতে হাঁটুজলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া স্নান সারিয়া কোলে চড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতাপুত্রে বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়া গিয়াছে।

ছেলে কোলে করিয়া কুসুম সুমুখে আসিল। মুখ তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত। মাথার আঁচল ললাট স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। যাইবার সময় সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের আভাসমাত্রও সে-মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সদ্যঃবিকশিত গোলাপের মত ওষ্ঠাধর চাপাহাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা একেবারে নাই ; সহজভাবে কহিল, এবার তুমি যাও, স্নান করে এস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
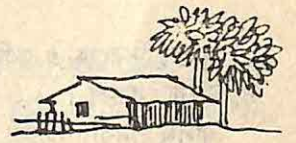
মাসখানেক হইল, কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও জ্বর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ গৃহদেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার জো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ-ছয়দিন ছিল। মনের মতন নূতন মা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিবাহ না হইতেই সে যে-সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিবার উপক্রম করিতেছিল। দাদাকে সে ভালমতেই চিনিত, ঠিক বুঝিয়াছিল, দাদা শাশুড়ীর পরামর্শে এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া ঘরজামাই হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে মাথায় টোপর পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথায় আর ধামা বহিতে চাহিল না। নলডাঙার লোক শুনিলে কি বলিবে ? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া বাহিরে পথের ধারে একটা চালা বাঁধিয়া, সে মনিহারীর দোকান খুলিয়া বসিল। এক পয়সাও বিক্রি হইল না। অথচ এই একমাসের মধ্যেই সে নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন-চারিবার শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করিল। পূর্বে কুঞ্জ কুসুমকে ভারী ভয় করত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বসে, না হয় কোথায় সরিয়া যায়—সমস্ত দিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম প্রমাদ গণিল। তাহার যে কয়েকটি জমানো টাকা ছিল, তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলিল না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং ঝিমায়। লোক জুটিলে শ্বশুরবাড়ির গল্প এবং নূতন বিষয়-আশয়ের ফর্দ তৈয়ার করে।

সেদিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বার্নিশ-করা জুতায় তেল মাখাইয়া চকচকে করিতেছিল, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, আবার আজও নলডাঙায় যাবে বুঝি ?

হুঁ, বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে কাজ করিতে লাগিল।

খানিক পরে কুসুম মৃদুস্বরে কহিল, সেখানে এই ত সেদিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটার খবর পাইনি, বড় মনখারাপ হয়ে আছে।

কুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া কহিল, তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। সে ভাল আছে।

কুসুমের রাগ হইল। কিন্তু সংবরণ করিয়া বলিল, ভালই থাক। তবু একবার দেখে এসো গে, শ্বশুরবাড়ি কাল যেয়ো।

কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল—কাল গেলে কি করে হবে ? সেখানে একটি পুরুষ মানুষ পর্যন্ত নেই। ঘরবাড়ি বিষয়-আশয় কি হচ্চে, না হচ্চে—সব ভার আমার মাথায়—আমি একা মানুষ কতদিক সামলাব বল্ ত ?

দাদার কথার ভঙ্গীতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, পারবে সামলাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও—কি জানি কেন সত্যিই তার জন্যে বড় মন কেমন কচ্ছে।

কুঞ্জ জুতা-জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া অতি রুক্ষস্বরে কহিল, আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসেনি কেন, এতই কি সে আমার চেয়ে বড়লোক যে, একবার আসতে পারলে না, শুনি ?

কুসুমের উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শান্তভাবে বলিল, তাঁর জ্বর হয়েছিল।

হয়নি। নলডাঙ্গায় বসে মা খবর শুনে বললেন, মিছে কথা, চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কাজ নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর দিতে পারেন, তা জানিস ? নেমকহারাম আর কাকে বলে, একেই বলে। আমি তার মুখ দেখতেও চাইনে। বলিয়া কুঞ্জ গম্ভীরভাবে রায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল।

কুসুম বজ্রাহতের মত কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, নেমকহারাম তিনি ! নুন তাঁকে সেইদিন বেশী করে খাইয়েছিলে, যেদিন ডেকে এনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার, এ বোধ করি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই সে যেন শুনিতেই পাইল না, এইরকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম পুনরায় কহিল, যা তুমি তোমার বিষয়-আশয় বলচ, সে কা'র হত ? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে ?

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কে কার বিয়ে দিয়ে দেয় ? মা বলেন, ফুল ফুটলে কেউ আটকাতে পারে না। বিয়ে আপনি হয়।

আপনি হয় ?

হয়ই ত।

কুসুম আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গে। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, এ-সব কথা যদি তাঁহারা শুনিতে পান ! শুনিলে, প্রথমেই তাঁহাদের মনে হইবে, এই দুটি ভাই-বোন এক ছাঁচে ঢালা !

মিনিট-কুড়ি পরে নূতন জুতার মচমচ শব্দ শুনিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবে ?

কাল সকালে।

আমাকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় করে না ? লজ্জা হয় না ?

কেন, এখানে কি বাঘ-ভাল্লুক আছে যে তোক খেয়ে ফেলবে ? আমি সকালেই ত ফিরে আসব, বলিয়া কুঞ্জ শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া জ্বলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুতপ্ত দুষ্কৃতকারী নিরুপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ঠিক তেমনি মুখের চেহারা করিয়া বৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর মা, হুকুম দাও আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সারা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।

মা ঠাকুর-ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি করবি ?

তোমার দাসী আনব। যে চরণকে দেখবে, তোমার সেবা করবে, আবশ্যক হলে এই ঠাকুরঘরের কাজ করতেও পারবে। হুকুম দেবে ত মা ? প্রশ্ন করিয়া বৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত-দৃষ্টিতে জননীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মা এবার বুঝিলেন। কারণ, স্বজাতি ভিন্ন এ ঘরে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি তুই সত্যি বলছিস বৃন্দাবন ?

সত্যি বৈ কি মা ! ছেলেবেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান ; কিন্তু বড় হয়ে তোমার সামনে কখন ত মিথ্যে বলিনি মা !

আচ্ছা, ভেবে দেখি, বলিয়া মা একটু কাজে মন দিলেন।

বৃন্দাবন সুমুখে আসিয়া বলিল, সে হবে না মা। তোমাকে আমি ভাবতে সময় দেব না। যা হোক একটা হুকুম নিয়ে এ ঘর থেকে বার হব বলে এসেছি, হুকুম নিয়েই যাব।

কেন ভাবতে সময় দিবিনে ?

তার কারণ আছে মা। তুমি ভেবে-চিন্তে যা বলবে, সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের হুকুম হবে না। আমি ভালমন্দ পরামর্শ চাইনে—শুধু অনুমতি চাই।

মা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু একদিন যখন অনুমতি দিয়েছিলুম, সাধাসাধি করেছিলুম, তখন ত শুনিস নি বৃন্দাবন ?

তা জানি। সেই পাপের ফলই এখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেচে, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ নত করিল।

সে যে এখন শুধু তাঁহাকেই সুখী করিবার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে এবং ইহা কাজে পরিণত করিতে তাহার যে কিরূপ বাজিবে, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মার চোখে জল আসিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, এখন থাক্ বৃন্দাবন, দু'দিন পরে বলব।

বৃন্দাবন জিদ করিয়া কহিল, যে কারণে ইতস্ততঃ করচ মা, তা দু'দিন পরেও হবে না। যে তোমাকে অপমান করেচে, ইচ্ছে হয়, তাকে তুমি ক্ষমা করো, কিন্তু আমি করবো না। আর পারিনে মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে বাঁচি।

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা অনুমতি দিলুম।

এ নিশ্বাসের মর্ম বৃন্দাবন বুঝিল, কিন্তু সেও আর কথা কহিল না। নিঃশব্দে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া, পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতমশায়, আপনার চিঠি, বলিয়া পাঠশালের এক ছাত্র আসিয়া একখান পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি বৃন্দাবন?

জানিনে মা, দেখি, বলিয়া বৃন্দাবন অন্যমনস্কের মত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কাটাকুটি নাই, বর্ণাশুদ্ধি নাই, উপরে শ্রীচরণকমলেষু পাঠ লেখা আছে, কিন্তু নীচে দস্তখত নাই। কুসুমের হস্তাক্ষর সে পূর্বে না দেখিলেও তৎক্ষণাৎ বুঝিল, ইহা তাহারই পত্র।

সে লিখিয়াছে—দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিনিতে পারিবে না। কেন, তাহা অপরকে কিছুতেই বলা যায় না, এমন কি, তোমাকে বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হইতেছে। তিনি আবার আজিও শ্বশুরবাড়ি গেলেন। হয়ত কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন, কারণ বলিয়া গিয়াছে, এখানে বাঘ-ভাল্লুক নাই, একা পাইয়া আমাকে কেহ খাইয়া ফেলিবে, এ আশঙ্কা তাঁহার নাই। তোমার অত সাহস যদি না থাকে, আমার চরণকে দিয়া যাও।

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুসুম উনানে জল ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহা জ্বলে নাই। সারাদিন অভুক্ত। ভয়ে ভাবনায় সহস্রবার ঘর-বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রহিল না এবং এই নির্জন নিস্তব্ধ বাটীতে সমগ্র রাত্রি নিজেকে নিছক একাকী কল্পনা করিয়া যখন বারংবার তাহার গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল, এমনি সময়ে বাহিরে চরণের সুতীক্ষ্ণকণ্ঠের মাতৃ-সম্বোধন শুনিয়া তাহার জলমগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পরে কুঞ্জনাথের নূতন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ চরণ, তোমার বাবা কি কচ্ছেন?

চরণ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুঁটুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমি ভুলে গেছি মা, বাবা তোমাকে দিলেন।

কুসুম হাতে লইয়া বুঝিল, তাহাতে টাকা আছে।

চরণ কহিল, দিয়েই বাবা চলে গেলেন।

কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে চলে গেলেন রে?

চরণ হাত তুলিয়া বলিল, ঐ যে হোথা থেকে।

এ-পারে এসেছিলেন তিনি?

চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এসেছিলেন ত।

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেই বক্ষলগ্ন চরণের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—কি মা?

কুসুম চরণকে বুকে চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, কাকে বেশী ভালবাসিস বল্ ত চরণ ? তোর বাবাকে, না আমাকে ?

চরণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমাকে মা।

বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ ?

হাঁ, দেবো।

তোর বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি ত ?

হাঁ, দেবো।

কোন্ অবস্থায় কি দিতে হইবে, ইহা সে বোঝে নাই, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নূতন মাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুসুমের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চরণ ঘুমাইয়া পড়িলে, সে চোখ মুছিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ভয় কি ! আমার ছেলে আছে, আর কেহ আশ্রয় না দিক, সে দেবেই।

পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরে মাতাপুত্র নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল, এক প্রৌঢ়া নারী প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছেন এবং কুঞ্জনাথ সবিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শ্বাশুড়ী। শুধু কৌতূহলবশে জামাতার কুটীরখানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছে, একমাত্র কন্যা-রত্নকে কোনদিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কি না।

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। আর্দ্র এলোচুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার বামকক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ঘটি। সংসারে এমন মাতৃমূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে, তখন অবাক হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। কুঞ্জনাথও হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, এই কুসুম বুঝি ?

কুঞ্জ খুশী হইয়া কহিল, হাঁ, মা, আমার বোন।

সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকানো, তাই কুসুম সেইখানেই ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়ের দেখাদেখি চরণও প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন, এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, আমি চরণ। ঠাকুরমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে মামাবাবুর মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

কুসুম সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, ছি বাবা, বলতে নেই ! মামীমাকে দেখতে গিয়েছিলুম বলতে হয়।

কুঞ্জর শাশুড়ী বলিলেন, বেন্দা বোষ্টমের ছেলে বুঝি ? একফোঁটা ছোঁড়া কথা দেখ !

দারুণ বিস্ময়ে কুসুমের হাসিমুখ একমুহূর্তে কালি হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তারপর ঘড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ এ কি ব্যাপার হইয়া গেল !

কুঞ্জ নির্বোধ হইলেও শাশুড়ীর এত বড় রুক্ষ কথাটা কানে বাজিল, বিশেষ ভাগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান করিয়া সে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে বুঝিয়াছিল, কুসুম ইহাকে আর কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাশুড়ীও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপে বলা তাঁহারই অভিপ্রায় ছিল না। শুধু শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রান্নাঘর হইতে কুসুম দাদার শাশুড়ীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরনে থান কাপড়, কিন্তু গলায় সোনার হার, কানে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাজু—নিজের শাশুড়ীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

দাদার সহিত তাহার কথাবার্তা হইতেছিল, কি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্বন্ধে হইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

তিনি পান এবং দোক্তাটা কিছু বেশী খান। সকাল হইতে শুরু করিয়া সারাদিনটাই সেটা ঘনঘন চলিতে লাগিল। স্নানান্তে তিলকসেবা অনুষ্ঠানটি নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই দুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ছোট আরশিটি পর্যন্ত ভুলিয়া আসেন নাই।

কুসুম নিত্যপূজা সারিয়া রাঁধিতে বসিয়াছিল, তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, কৈ গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলকসেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা ?

কুসুম সংক্ষেপে কহিল, আমি ওসব করিনে।

করিনে বললে চলবে কেন ? লোকে তোমার হাতে জল পর্যন্ত খাবে না যে !

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তাহলে আলাদা রান্নার যোগাড় করে দি ?

আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুম—কিন্তু পরে খাবে না ত !

কুসুম জবাব দিল না।

কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চরণ কখন এল কুসুম ?

কাল সন্ধ্যার সময়।

কুঞ্জর শাশুড়ী কহিলেন, এই শুনি, বেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে-চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে ত !

কুঞ্জ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় শুনলে মা ?

মা গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, আমার আরও চারটে চোখ-কান আছে। তা সত্যি কথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাহাঁটি করলে তবু তোমার বোন রাজী হল না। লোকে নানা কথা বলবেই ত।

কুঞ্জ সায় দিয়া বলিল, সে ঠিক কথা মা।

কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, তুমি এখানে বসে কি কচ্চ দাদা ! উঠে যাও।

কুঞ্জ থতমত খাইয়া উঠিতে গেল কিন্তু তাহার শাশুড়ী উষ্ণ হইয়া বলিলেন, দাদাকে ঢাকলেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়বে না বাছা ! এই যে তুমি নদীতে চান কর, ভিজে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও দেখলে মুনির মন টলে কি না, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি ?

কুসুম চেঁচাইয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনো না—যাও এখান থেকে।

তাহার চীৎকার ও চোখমুখ দেখিয়া কুঞ্জ শশব্যস্তে উঠিয়া পলাইল। কুসুম উনান হইতে তরকারির কড়াটা দুম করিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জর শাশুড়ী মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা ; এই সহায়-সম্বলহীন মেয়েটা তাঁহাকে যে হতভম্ব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

তখন হইতে প্রায় মাস-দুই গত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কুঞ্জকে তাহার শাশুড়ী যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এখন প্রায়ই সে এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না। কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে ? শুধু যদি সে জানিত, সংসারে ইহারাই এরূপ হয়, এতটা পরিবর্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত না। ভাই-বোনের সে স্নেহ নাই, এখন কলহও হয় না। কলহ করিতে কুসুমের আর প্রবৃত্তি হয় না, সাহসও হয় না। সেদিন এক রাত্রি বাড়িতে একা থাকিতে সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কত রাত্রিই একা থাকিতে হয়। অবশ্য দুঃখে পড়িয়া তাহার ভয়ও ভাঙ্গিয়াছে।

তথাপি এ-সব দুঃখও সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে। রহিয়া রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও, বোধ করি দাদা একবার কাঁদিবে না—একফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে দাদার এই নিষ্ঠুর ত্রুটি সে তখনি নিজের চোখের জল জল দিয়া ক্ষালন করিয়া দিতে ঘরে দোর দিয়া বসে, আর সেদিন দোর খোলে না।

তাহারি হাতে একদিন সে অনেক সঙ্কোচ এড়াইয়া বৃন্দাবনকে একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে যে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। কারণ যে প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম পথ চাহিয়া রহিল, তা ত আসিলই না, দু' ছত্র কাগজে-লেখা জবাবও আসিল না। শুধু আসিল কিছু টাকা। বাধ্য হইয়া, নিরুপায় হইয়া কুসুমকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতে কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ কি হইল মৃদুকণ্ঠে বলিয়া বসিল, এক্ষণি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না, দুটো খেয়ে যাও না।

কতক রান্না হইয়াছে, কতক বাকী আছে—উনান নিবিয়া গিয়াছে। চরণ চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে সু-উচ্চ মাতৃ-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ি ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ডাকে কুসুম দোর খুলিয়া বাহির হইতে তাহার অশ্রু-কষায়িত দুই চোখের শান্ত বিপন্ন দৃষ্টি সর্বাগ্রেই বৃন্দাবনের বিস্ময়-বিহ্বল জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা কাঁদচে বাবা!

বৃন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েচে। তখন তোমাকে আমি চিনতে পারিনি।

বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বেলা হ'ল। চরণ, তুই থাকবি, না যাবি রে? থাকবি? আচ্ছা থাক্। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো। আমার বিশ্বাস, ও-বাড়িতে ওর হাত ধরে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার খুব মস্ত অপমান হতো না। যাক চললুম, বলিয়া পা বাড়াইতে কুসুম সহসা চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ সমস্ত বুঝলুম। আমার এত বড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাঁড়িয়ে উঠে জবাব দিলে, বেলা হল চললুম, আমি কত নিরাশ্রয় তা স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলে না, তখন তোমাকে বলবার বা আশা করবার আর কিছু নেই। তবু আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?

বৃন্দাবন ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিনি, বরং তুমিই নিতে বারংবার অস্বীকার করেচ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিছে কথা। আমার কপালের দোষে আজ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখতে পাইনি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে-বাড়ির বৌ। কি করে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে, পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাওনি। কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উঞ্ছবৃত্তি করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশী কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প। আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মালমসলা যুগিয়ে দেব না।

বৃন্দাবন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, চললুম। আমার আর কিছুই বলবার নেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাহারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত
লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোনো কারণেই
প্রতিপক্ষের রাগারাগি, বা উচ্চ তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি সেদিন কুসুমের বারংবার
নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া
তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ি
পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিবে এবং হয়ত আসিবেও। যদি
সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া
মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল—যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস
ছিল। যত বড় অবস্থাসংকটই হোক, কোন-না-কোন উপায়ে তিনি সবদিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়,
তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায়
আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে।

দুপুরবেলা গাড়ি একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া
দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পণ্ডিতমশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেকে
পোড়ো কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন
কাটিয়া যাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ ভক্ষণে। এটা বোধ করি, অকৃত্রিম
ভক্তিবশতঃই—ছাত্রেরা এ সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতাইয়ের অমর্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ একদিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের
তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘন্টা হইতে কমাইয়া পনর মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু
আরতির সময়টা গৌরাঙ্গপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে সেদিকেও
খরদৃষ্টি রাখিল।

দিন-দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে
গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া, বসিতে
আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া, চিনতে পারলে না ?

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।

তিনি বলিলেন, আমার কাজ আছে তা পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ
যাবার পূর্বে একবার দেখতে এলাম—আমি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্যসুহৃদকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব ইংরাজী-শিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর
ভাগিনেয় ইনি। পনর-ষোল বৎসর পূর্বে এখানে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন, সেই সময় উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়।
দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকেও
বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্যবন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব পাঁচ-ছয় বৎসর হইল এম এ পাশ করিয়া কলেজের শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী
চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, আমার মামা মিথ্যে কথা ত দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না ;
গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন ; কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ
মানুষ হয়েচে কিনা তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে
তোমাকে দেখতে এসেছি।

কথাগুলা বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ এই স্তুতি তাহাই পরম পূজণীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, যাক্, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বলব না, শুধু মামার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাজের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, শুনি মাইনে নাও না, পোড়োদের বই-টই কাপড়-চোপড় পর্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজী ছিলুম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি এতগুলি ছেলে যোগাড় করলে কি করে বল ত ভায়া ?

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বলচি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি,, যদি দেশের কোনো কাজ থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পন্ডশ্রম। অন্ততঃ আমার ত এই মত যে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে। ইঞ্জিনে স্টিম হলে তবে গাড়ি চলে, নইলে এতবড় জড় পদার্থটিকে জনকতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি করে একচুলও নড়াতে পারবে না। যাক, তুমি এ-সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুলতে না। আমি এইজন্যে বিয়ে পর্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখবার বালাই নেই, তাই প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে—শেষে একটা সকুলে দাঁড় করাব মনে করি—তা আমার পাঠশালাই চলল না—ছেলে জুটল না। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি শয়তান যে, কোনমতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট করে দিনকতক ছোটলোকদের বাড়ি পর্যন্ত ঘুরেছিলাম—না, তবুও না।

বৃন্দাবনের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায় নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, না হে না—তোমাকে—তোমাদের সে কি কথা ! ছি ! ছি ! তা আমি বলিনি, সে কথা নয়—কি জানো—

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা—তাঁত বুনি, লাঙ্গল ঠেলি, গরু চরাই—জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী অফিসের দোর গোড়ায় যেতে পারিনে, কাজেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাজেও আমাদের বাড়িতে ঢুকলে তোমাদের মত উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বৃন্দাবন, সত্যি বলচি ভাই, তোমাকে আমি চাষাভুষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেছি। যদি জানতুম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কখনো এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলাকদের সঙ্গে মিলে রয়েচে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এইজন্যই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার পাঠশালায় জুটেচে ; আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করিতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না ; তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।

কেশব লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনতমুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি, এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ি বদ্যি, হাতুড়ে পন্ডিতই প্রসার-প্রতিপত্তি

লাভ করে—যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় ডাক্তার প্রফেসারও আমল পায় না। আমাদের
বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর
গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে,
সত্যই মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভাল হয়, না হয়, শিক্ষার
গুণে আমরা বেশী বুঝি ; তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্চ, আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্তব্য
আমাদের কথা শোনা।

বৃন্দাবন কহিল, দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান, তা দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্। কিন্তু তোমরা
আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পনর-আনা লোকই মনে করে,
যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষাভুষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংসারে লেখাপড়া
শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকে মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই
শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের
ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা করো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া
শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে
স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষাভূষোকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং
শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্গবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা অশ্রদ্ধা করবে না এবং
দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্য উন্মুখ হয়ে
উঠবে না। এ যতক্ষণ না করচ ভাই, ততক্ষণ জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না
তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে,
ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে,
তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বৃন্দাবন, বোধ করি তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, যদি
উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তা হলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাজে লাগবে না ?
বিশ্বাস না করলে, আমরা কি করে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর ? তার উপায় কি ?

বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বললুম, আচার-ব্যবহারে। আমাদের ষোল-আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের
দল কুসংস্কার বলে বর্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জনের
উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা হলে কোনদিনই আমরা বুঝতে পারব না, তোমাদের নির্দিষ্ট
কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর ?

না।

জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও ?

খাই।

মুসলমানের হাতের রান্না ?

প্রেজুডিস্ নেই। খেতে পারি।

তা হল আমিও বলতে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প
তোমার বিড়ম্বনা—কিংবা আরও কিছু বেশী—সেটা বললে তুমি রাগ করবে ?

ধৃষ্টতা ?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছে এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের
ভাল করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধি-বিবেচনায় ধর্মেকর্মে এত এগিয়ে গেলে
তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু
পাঠশালের কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার আসব, বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের
ধূলা গ্রহন করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি হইলেও কেশব শহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্যবন্ধুকে দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি—বুঝলে ত?

কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেচি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থই মানুষ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই। তারপরে?

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙ্গে গেছে। শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞেস কচ্চি, এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েচে সেখানে ক খ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা এ কাজ কি গভর্নমেন্টের করা উচিত নয়?

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হল।

দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তক্ষুণি দুই দুই হাত তুলে বলবে—পন্ডিতমশাই, মাধুও করেচে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে গভর্নমেন্ট তাঁর কর্তব্য করেন কি না। নিজের কর্তব্য করার আগে পরের কর্তব্য আলাচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা ঠিক হল না ভাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, ত এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরী হয় না কেশব, বরং আশীর্বাদ কর যেন এই ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালায় একটি শর্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখতে পেতে প্রত্যহ বাড়ি যাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি-একটি ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবে। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলেবেলায় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙ্গলাদেশে একটি লোকও মূর্খ থাকবে না।

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ—কি ভয়ানক আশা!

বৃন্দাবন বলিল, সে বলতে পার বটে। দুর্বল মুহূর্তে আমারও ভয় হয় দুরাশা, কিন্তু সবল মুহূর্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ!

কেশব কহিল, বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখলে জবাব দেবে বল?

এ আর বেশী কথা কি কেশব?

বেশী কথাও আছে, বলচি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?

তাও করব, বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

নবম পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের দোল-উৎসব বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিতেন। কাল তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে বৃন্দাবন অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই, মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, বৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা!

জননীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বৃন্দাবন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা ?

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, আমি ত চিনিনে বাছা, তোর পাঠশালার একটি ছাত্তর বাইরে বসে বড় কাঁদচে—তার বাপ নাকি ভেদবমি হয়ে আর উঠতে পারচে না।

বৃন্দাবন ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। পণ্ডিতমশাই, বাবা আর চেয়েও দেখচে না, কথাও বলচে না।

বৃন্দাবন সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবুর তখন শেষ সময়। প্রতি বৎসর এই সময়টায় ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা-রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্যন্ত টিকিয়াছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘন্টাখানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।

বাঙ্গালাদেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আপনা-আপনি শিক্ষিত এক-আধজন ডাক্তার বাস করেন, এ গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন। কাল রাত্রে তাঁহাকে ডাকিতে যাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দু টাকা ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ঠিক জানিতেন ধারে কারবার করিলে এ-সব রোগে তাঁহার ঔষধ খাইয়া ছোটলোকগুলা পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া নুন-জল খাওয়াইয়া স্বামীর শেষ চিকিৎসার সমাধা করিয়া, সারা রাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে। তারপর সকালবেলা এই।

বৃন্দাবন বড়লোক, এ গ্রামে তাহাকে সবাই মান্য করিত। মৃত স্বামীর গতি করিয়া দিবার জন্য শিবুর সদ্য-বিধবা তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল তাহার অনশন ও অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও বৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক গতি করিয়াছে, শিবুরও গতি করিয়া অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও বৃন্দাবন চন্ডীমন্ডপের বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয় বোস ষষ্ঠীচরণ, বলিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল।

ছেলেটি বার-দুই ঠোঁট ফুলাইয়া 'পন্ডিতমশাই' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

সদ্য-পিতৃহীন শিশুকে বৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কেষ্টাও বমি কচ্চে!

কেষ্টা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সহিত পাঠশালে লিখিতে আসিত।

আজ রাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই বৃন্দাবনের সহিত কেষ্টাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিভ দেখিলেন, ঔষধ দিলেন, কিন্তু অবাধ্য কেষ্টা মায়ের বুকফাটা কান্না, চিকিৎসকের মর্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, রাত্রি ভোর না হতেই গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিশ্রুত হাতযশ খারাপ করিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সদ্য-বিধবা জননীর মর্মান্তিক বিলাপে বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে চাহিয়া সহস্রবার মনে মনে বলিল, মানুষের দোষের শাস্তি

আর যা ইচ্ছে হয় দিয়ো ভগবান, শুধু এই শাস্তি দিয়ো না—জানি না, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতে পাইলেন কিনা, কিন্তু নিজে আজ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যাহারই থাক, তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই তিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী কলেরায় মরমর হইয়াছে।

মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘন্টাখানেক পরে আর্তক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার গ্রামে মহামারী শুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল ; অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা ভীতশুষ্ক-মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, অন্নজল ফুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিব ?

বৃন্দাবনের বাড়ির সুমুখ দিয়াই গ্রামের বড় পথ, তথায় যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্নজল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশপাশের গ্রামেও দুই-একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাড়লের অবস্থা প্রতিমূহর্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

নদী নাই, যে দুই-চারটা পুষ্করিণী পূর্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার-অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ কাহারো তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আহার্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত তাহার ভালমন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই ; তিনি গরীবের ঘরে যাইবার সময় পান না, অথচ মহামারী প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ঔষধপথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহের সৎকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।

শুধু বৃন্দাবনের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রসিকের স্ত্রীর মৃত্যু ব্যতীত এই পাঁচ-সাতটা বাটীতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই।

বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জল তখনও দুষ্ট হয় নাই, প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয়ব্যবহার করিয়া সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

কিন্তু, প্রতিদিন বৃন্দাবন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের মুখের পানে চাহিলেই তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্যে অভেদ্য অন্তরায় তাহাদের পিতাপুত্রের মাঝখানে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে! তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু শুনিলেই চমকাইয়া উঠে। ডাকিতে আসিলে যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রতি পদক্ষেপ বিচারালয়ের অভিমুখে অপরাধীর চলনের মত দেখায়। শুধু তাহার চিরদিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। মৃতদেহ সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবল মনে হয়, অজ্ঞাতসারে কোন সংক্রামক বীজ বুঝি এইমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে তাহাকে বাহিরের সর্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

তারিণী মুখুয্যের ছোটছেলে মরিয়াছে। পরদিন সকালবেলা বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল, তাহারই পুকুরের ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি কাপড়চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকী আছে। বস্ত্রখণ্ডগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, মড়ার কাপড়চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করচেন ?

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল, তাহা বোঝা গেল না।

বৃন্দাবন বলিল, যতটা অন্যায় করেচেন, তার ত আর উপায় নেই, কিন্তু আর ধোবেন না—উঠে যান।

সে পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দেখিল তারিণী

দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়া পাগলের মত চোখমুখ করিয়া বলিল, তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নাবতে দাওনি ?

বৃন্দাবন কহিল, তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেচি।

তরিণী চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় ধোবে ? থাকব বাড়লে, ধুতে যাবো বদ্দিবাটীতে ? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু চেঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয় ; তাই আত্মসংবরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তত ক্ষতি নাই ; কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করেচেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্চে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না ?

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়চোপড় কাছে না ত কি তোমার মাথার ওপর কাছে বাপু ?

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ির কোন লোককে আমি পুকুরে নাবতে দেব না।

নাবতে দিবিনে ত, আমরা যাব কোথায় বলে দে ?

বৃন্দাবন কহিল, এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটলোক হয়ে তোর এতবড় মুখ ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে ? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসী-চাকর নেই, তখন মানুষ হ'ন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না। বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে ঘোষাল মহাশয় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, হাঁ বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার ? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্চে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ নাকি ?

বৃন্দাবন কহিল, ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জল তোলা বন্ধ করিনি।

ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর মায়ের কাছে যাবি রে চরণ ?

চরণ নাচিয়া উঠিল—যাব বাবা।

বৃন্দাবন মনে মনে একটু আঘাত পাইয়া বলিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে অনেকদিন থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে ?

চরণ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, পারব।

বস্তুত এ-দিকের সূক্ষ্ম বাঁধাধরা আঁটাআঁটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পায় না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাথীদের মুখ দেখিতে পর্যন্ত পায় না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কিরকম একটা ভীতসন্ত্রস্ত ভাব, ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ও-দিকে মায়ের অগাধ স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা—স্নান, আহার, খেলা কিছুতেই নিষেধ নাই, হাজার দোষ করিলেও হাসিমুখে সস্নেহের অনুযোগ ভিন্ন, কাহারও ভ্রূকুটি সহিতে হয় না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

তবে যা, বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাক্স জামায়-কাপড়ে পরিপূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল এবং সজলচক্ষে ছেলের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া, দুঃখের ভিতরেও একটা সুগভীর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিল এবং প্রত্যহ না হোক, একদিন অন্তর সংবাদ জানাইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারি না।

গাড়ি যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হঠাৎ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে কুসুম রাগ করে। মনে মনে বলিল, কাজটা ঠিক হল না। অত বড় একজিদী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে হয়ৎ উলটো বুঝে একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠবে। একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া অবিলম্বে গরুর গাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জনাথের বাটীর সুমুখে আসিয়া, বাহির-বাটির চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া গেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাব।

সাড়া পাইয়া কুসুম ঘর হইতে 'দাদা' বলিয়া বাহিরে আসিয়াই অকস্মাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া ঈর্ষায় অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া, চক্ষের নিমেষে পিছাইয়া ঘরে ঢুকিল। চরণ পূর্বের মত মহোল্লাসে চেঁচামেচি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথায় রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কৈ ?

কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

বৃন্দাবন কহিল, দেখে মনে হয় এ যেন পোড়ো-বাড়ি। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না ?

না।

কোথায় ছিলে ?

মাসখানেক পূর্বে কুসুম দাদার শাশুড়ীর সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে কথা না বলিয়া তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিল, এখানে সেখানে নানা জায়গায় ছিলুম।

অন্যবারে কুসুম সর্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এবার তাহা দিল না দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলল, দাঁড়িয়ে রয়েচি, একটি বসবার জায়গা দাও।

কুসুম তেমনি অবজ্ঞাভরে বলিল, কি জানি কোথায় আসন-টাসন আছে, বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পা নড়িল না।

বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও এতবড় অবহেলা তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সেদিনের উত্তেজনাবশতঃ কলহ করিয়া ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল না, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া নম্রস্বরে বলিল, আমি বেশীক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। যেজন্য এসেছি, বলি। আমাদের ওখানে ভারী ব্যা'মো হচ্চে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।

কুসুম এতদিন এখানে ছিল না বলিয়াই ব্যারাম-স্যারামের অর্থ বুঝিল না, তীব্র অভিমানে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, ওঃ—তাই দয়া করে নিয়ে এসেচ? কিন্তু অসুখ-বিসুখ নেই কোন্ দেশে? আমিও বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে করব কি সাহসে?

বৃন্দাবন শান্তভাবে কহিল, আমি যে সাহসে করি, সেই সাহসে। তা'ছাড়া তোমাকেই বোধ করি, ও সবচেয়ে ভালবাসে।

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, মা বাবা বলেচে, আমি তোমার কাছে থাকব—নাইতে যাবে না, মা?

কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে শুনাইয়া কহিল, আমার কাছে তোমার থেকে কাজ নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।

বৃন্দাবন অতিশয় ম্লান একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাও শুনেচ। আচ্ছা, বলচি তা' হলে। মা একা আর পেরে ওঠেন না বলেই একবার ও-কথা উঠেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেছে।

থামল কেন?

তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু সে কথায় আর কাজ নেই।—চরণ, আয় রে, আমরা যাই—বেলা বাড়চে।

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, বাবা, কাল যাব।

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, বাবা, কাল যাব।
বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না কহিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট-দুই পরে
বৃন্দাবন গম্ভীরস্বরে ডাক দিয়া বলিল, আয় দেরি করিস্ নে রে, আয়, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।
চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনদের আদেশ পালন করিতে শিখিয়াছিল, তথাপি সে মায়ের মুখের
দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুব্ধমুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।
গাড়োয়ান গরু দুটাকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া
রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।
তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুর ; হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া
আড়ালে থাকিয়া ডাকিল, একবার শোনো।

বৃন্দাবন কাছ আসিয়া কহিল, কি?

তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল?

না।

তবে, এমন কেন? শুকনো দেখাচ্চে।

তা ত' বলিতে পারিনে। বোধ করি ভাবনায় চিন্তায়
আসিয়াছিল, শেষ কথায় পুনর্বার
ভাবনা চিন্তা। স্বামীর শীর্ণমুখের পানে চাহিয়া তার জ্বালাটা নরম হইয়া
জ্বলিয়া উঠিল। শ্লেষ করিয়া কহিল, তোমার ত ষোলোআনাই সুখের! ভাবনা-চিন্তা কি শুনি?

বৃন্দাবন ইহার জবাব দিল না। গাড়ি প্রস্তুত হইলে, চরণ উঠিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, তোর মাকে প্রণাম করে এলিনে রে?

সে নামিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুসুম ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও এ কথাটা সে বুঝিয়াছিল, মাতা তাহাকে আজ আদর করে

নাই, এবং সে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখে নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, কে জানে, যদি আর কখন না বলতে পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই। আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাঁই দিলে না, কিন্তু, আমার অবর্তমানে দিয়ো।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—ও-সব আমি শুনতে চাইনে।

তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসেছিলুম।

আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, তবু সেই রাগের কথা। কুসুম, তুমি অনেক শিখেচ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড়-শেখা এটা কেন শেখোনি! কিন্তু তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে কার হাতে হয় বল?

কুসুম হঠাৎ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

গরু দুটা বাড়ি ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, বাবা, এসো না!

কুসুম কিছু বলিবার পূর্বেই বৃন্দাবন 'যাই' বলিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

কুসুম সেইখানে বসিয়া মহা অভিমান ভরে কাঁদিতে লাগিল।

একস্থানে একভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, ভগবান, আমার যা হোক একটা উপায় করে দাও। হয় মাথা তুলিয়া সগর্বে স্বামীর ঘরে যাইতে দাও, না হয় ছেলেবেলার সেই নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরাইয়া দাও, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমন কলহপটু। বয়স এখনও পনর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথার বাঁধুনি ও বিষের জ্বলনে তাহার মাকেও হার মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত।

এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে কি জানি কেন, চোখের দেখামাত্রই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুশী হন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে যা-তা বলিতে লাগিলেন।

বাড়ির সম্মুখেই পুষ্করিণী, তিন-চার দিন পরে, একদিন সকালে সে কতকগুলো বাসন লইয়া ধুইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ ঠাকুরঝি, মা তোমাকে ক'টাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা?

মা অদূরে ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, মেয়ের তীব্র শ্লেষাত্মক প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন, এ তোর কি রকম কথার ছিরি লা? মানুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে?

মেয়ে উত্তর দিল, আপনার জন আমার, তোমার এ কে যে, দুঃখী মানুষকে দিয়ে দাসীবৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না?

প্রত্যুত্তরে মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হাত হইতে বাসনগুলো একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন।

কুসুম হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া তা যাক বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। প্রদীপ যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সত্যই কাজটা ভাল করনি দিদি। অবশ্য কি করেছিলে, তা আমি জানিনে, কিন্তু মনে যখন জানো তিনি কে, আর তুমি কে, তখন তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হয়নি।

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী কহিল, তোমাদেরই কথা তোমারই মুখ থেকে যতদূর শুনেচি, আমার তেমন অবস্থা হলে, পায়ে হেঁটে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি হুকুম দিতেন, সারা পথ নাকখত দিয়ে যেতে হবে, আমি তাই যেতুম।

কুসুম পূর্ববৎ থাকিয়াই এবার অস্ফুটে বলিল, বৌ, মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাজে করা শক্ত।

কিছু না। গেলে স্বামী পাবো, ছেলে পাবো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত পাওয়ার কাছে মেয়েমানুষের শক্ত কাজ কি দিদি? তাও যদি না পাই, তবু ফিরে আসতুম না—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে আর ভয়টা কি? বড়জোর বলতেন, তুমি যাও; আমিও বলতুম, তুমি যাও—জোর করে থাকলে কি করতেন তিনি?

তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসাইবার জন্য, সান্ত্বনা দিবার জন্য বলে নাই। অধিকতর গম্ভীর হইয়া কহিল, সত্যি বলচি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনো না—যাও তাঁর কাছে। এমন বিপদের দিনে স্বামী-পুত্রকে একা ফেলে রেখো না।

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে কুসুম সব ভুলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বিপদের দিন কেন?

ব্রজেশ্বরী বলিল, বিপদের দিনে বৈ কি! অবশ্য, তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাওঠা শুরু হয়েছিল, তোমার দাদা এখনি বললেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে—প্রত্যহ দশজন বারজন করে মারা পড়চে—ছি, ছি, ওকি কর—পায়ে হাত দিয়ো না ঠাকুরঝি।

কুসুম তাহার দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিইনি—আমি কিছু শুনিনি বৌদি—

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিল, বেশ, এখন শুনলে ত! এখন গিয়ে তাকে নাও গে!

কি করে যাবো?

ব্রজেশ্বরী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দোর ঠেলিয়া চৌকাঠের ও-দিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতে তীব্র শ্লেষের সহিত বলিলেন, ঠাকুরঝি-ঠাকরুনকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্চে শুনি?

ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিকস্বরে কহিল, বেশ ত মা, ভেতরে এসো বলচি। তোমার কিন্তু কোন ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মতলব দেয় না, আমিও দিচ্চিনে।

মা বহুক্ষণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার মানে আমি লোকজনকে কু-মতলব দিয়ে থাকি, না? তখনি জানি, ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেচে, তখন এ-বাড়িও ছারখার করবে। সাধে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, এই স্বভাব-রীতির গুণ।

মেয়েও তেমনি শক্ত কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুমের হাতের চিমটি খাইয়া থামিয়া বলিল, সেইজন্যেই কালামুখীকে বলছিলুম, যা শ্বশুরঘর কর্‌ গে যা, থাকিস নে এখানে।

শ্বশুরবাড়ির নামে মা তাম্বুলরঞ্জিত অধর প্রসারিত ও তিলকসেবিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বলি কোন্‌ শ্বশুরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস লো? নন্দ বোষ্টম—

এবার ব্রজেশ্বরী ধমক দিয়া উঠিল—সমস্ত জেনে ন্যাকা সেজে খামকা মানুষকে অপমান করো না। শ্বশুরঘর মেয়েমানুষের দশ-বিশটা থাকে না যে, আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুনতে হবে।

মেয়ের নিষ্ঠুর স্পষ্ট ইঙ্গিতে মা বারুদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতভাগী মেয়ে হয়ে তুই মায়ের নামে এতবড় অপবাদ দিস্‌!

মেয়ে বলিল, অপবাদ হলেও বাঁচতুম মা, এ যে সত্যি কথা। সত্যি বলচি মা, তোমাদের মত দু-একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়ী মুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোষ্টম বলতে মাথা কাটা যায়। থাক, চেঁচামেচি করো না, যদি অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দুঃখ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা মুখে আসে, তাই বলে আমাকে গাল দিয়ো; তোমার দিব্যি করে বলচি মা, কথাটি কব না।

মেয়ের সুতীক্ষ্ণ শরের মুখে মা বুঝিলেন, যুদ্ধ এভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারই পরাজয় হইবে, কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন, সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা তারা ঘরে নেবে কেন? তার চেয়ে আমি ঢের বেশী

জানি ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়, বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই। মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াস নে, বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরে না শুনিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানি উঁচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বোন, মিথ্যে কথা। মা জেনেশুনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে স্বীকার করচি—আচ্ছা, এখনি আসচি আমি, বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা সপ্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদন তাহাকে কর্তব্যবিচলিত করিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হতে পারে না। মা না বললে আমি চরণকে এখানে আনতে পারিনে।

ব্রজেশ্বরী কহিল, অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসো, তাঁরা কেমন আছেন।

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! দশ-বিশটা রোজ মরচে সেখানে।

তবে কোন লোক পাঠিয়ে দাও, খবর আনুক।

তা হতে পারে বটে। বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম স্নান করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দাসী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, মা বারণ করলেন, দিদিঠাকরুন, আজ আর রান্নাঘরে ঢুকো না।

কথাটা শুনিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন?

সে ত জানিনে দিদি, বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ এ-ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে সময়ও যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সে আর একবার ব্রজেশ্বরীর সন্ধানে বাহিরে আসিতেছিল, মা সুমুখে আসিয়া বলিলেন, আর দেরি করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এস, এ-বেলার মত যা হোক মুখে দাও—তোমার দাদা ঠাকুরবাড়িতে মত জানতে গেছে।

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন মা নিজেই একটা করুণ সুরে বলিলেন, ব্যাটার বৌ যখন, তখন ব্যাটার মতই অশৌচ মানতে হবে। যাই হোক বৃন্দাবনের মা দোষে গুণে ভালমানুষই ছিল। সেদিন আমার ব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধ করতে এসে কত কথা! আজ ছ'দিন হয়ে গেল বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা সে যা হবার হয়েচে, এখন মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন। কি নাম বাছা তার? চরণ না? আহা! রাজপুত্তুর ছেলে, আজ সকালে তারও দু'বার ভেদবমি হয়েছে।

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে; ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরঝিকে তোরা কেউ দেখেছিস রে?

না দিদি, সেই সকালেই দেখেছিলুম।

পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, সে কি কথা? কোথায় গেল তবে সে?

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, জানিনে, আমি ঘরদোর, পুকুর, বাগান সমস্ত খুঁজেচি, কোথায় দেখতে পাচ্চিনে।

চোখের জল ও পুকুরের উল্লেখে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল—তবে সে আর নেই। মা'র গঞ্জনা সইতে না পেরে নিশ্চয়ই সে ডুবে মরেচে, বলিয়া ছুটিয়া বাইরে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, শোনো—অমন করে যেয়ো না—

আমি কিছু শুনতে চাইনে, বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে মেয়েমানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, মা আমার বোনকে মেরে ফেলেচে—আর আমি থাকব না, আর এ বাড়ি ঢুকব না—ওরে কুসুম রে—

তাহার শাশুড়ী কিছুই জানিতেন না, চীৎকারের শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল—ওই রাক্ষসীই আমার ছোটবোনটিকে খেয়েচে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এসেছিলুম রে—ওরে আমার কি হল রে!

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—দূর হ—দূর হ! ছুঁসনি আমাকে।

ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার জোর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, শুধু কাঁদলে আর চেঁচালেই কি বোনকে ফিরে পাবে? আমি বলচি সে কক্ষনো ডুবে মরেনি! কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, একভাবেই কাঁদিতে লাগিল। এই বোনকে সে অনেক দুঃখকষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং যথার্থই তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত। পূর্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল এবং তাহার অভিমানিনী ছোটবোনটির মৃতদেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, তুমি স্থির হও—আমি নিশ্চয়ই বলচি, সে মরেনি।

কুঞ্জ সজলচক্ষে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী, আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন।

কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, সেখানে সে যাবে না। চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে দেখতে পারত না।

ব্রজেশ্বরী কহিল, এটা তোমাদের পাহাড়-পর্বত ভুল! আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেও তার স্বামীকে তেমনি ভালবাসে। সে যাই হোক, চরণের জন্যও ত সে যেতে পারে!

কিন্তু সে ত বাড়লের পথ চেনে না।

সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ভুল করে পৌঁছুতে দেরি হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ে, নইলে বাড়ল সাত সমুদ্র তের নদীর পারে হলেও, সে একদিন না একদিনজিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাও, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে এসো।

চললুম, বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর তাহার চকচকে বিলাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল শ্বশুরবাড়িতেই পড়িয়া রহিল। পোড়ামুখী কুসীর শোকে, জমিদার কুঞ্জনাথবাবু ফেরিওয়ালা কুঞ্জ বোষ্টমের সাজে খালি পায়ে, খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া গেল।

ছয়দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পর কেহ কোনদিন এ অধিকার সুকৃতিবলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সেদিন তারিণী মুখুয্যের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিসম্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরনের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহুপরিমাণে মারীভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে, এমনি একটা বড়-রকমের কূপ যত ব্যয়ই হোক, নির্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে সে কলিকাতার কোন বিখ্যাত কল-কারখানার ফারমে পত্র লিখিয়াছিল, কোম্পানী লোক পাঠাইয়াছিলেন জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথাবার্তা ও চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা, দাসী ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুলচেন না?

বৃন্দাবন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, মা কি এখনো শুয়ে আছেন?

হাঁ দাদা, ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্চিনে।

বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিল, ওমা—মাগো! কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দমাত্র আসিল না। তখন লোহার শাবলের চাড় দিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলামাত্রই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ যেন মুখের উপর সজোরে ধাক্কা মারিয়া সকলকে বিমুখ করিয়া ফেলিল। সে ধাক্কা বৃন্দাবন মুহূর্তের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া ভিতর চাহিল।

শয্যা শূন্য। মা মাটিতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্নপ্রায়। ঘরময় বিসূচিকার ভীষণ আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেঝেয় পড়িয়া আর উঠিয়া পারেন নাই। জীবন কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে চাহিতেন না, তাই মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘুম ভাঙ্গাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার এমন অকস্মাৎ এরূপ শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সহ্য করা মানুষের সাধ্য নহে। বৃন্দাবনও পারিল না। তথাপি নিজেকে সোজা রাখিবার জন্য একবার প্রাণপণ-বলে চৌকাঠ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল; মিনিট-কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে। বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকল্প জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি নেই। কোথায় গেছেন, এ বেলা ফিরবেন না।

মায়ের সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল, পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপাইয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্বাদ করিলেন, তাহা কাহারও কানে গেল না বটে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে পৌঁছিল।

তখন তুলসীমঞ্চমূলে শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল, কতক্ষণ গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পরে মিলন-শ্রান্ত চক্ষু দুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া গেল।

অতঃপর এই ছয়টা দিন-রাত বৃন্দাবনের কাটিল শুধু এই জন্যে যে তাহা ভগবানের হাতে। তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু চরণ আর খেলাও করে না, কথাও কহে না। বৃন্দাবন তাহাকে কত রকমের মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল—নানাবিধ কলের গাড়ি জাহাজ, ছবি-দেওয়া পশুপক্ষী—যে-সমস্ত লইয়া ইতিপূর্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে হাত দিতেও চাহে না।

সে বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমাকে যখন চাদর-চাপা দিয়া খাটে তুলিয়া বিকট হরিধ্বনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চহিয়াছিল।

কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লাইলেন না, কেন গরুর গাড়ির বদলে মানুষের কাঁধে অমন করিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাঁদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশ বিহ্বল বিষণ্ণ মূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু বৃন্দাবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে কোনদিকে মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে যাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া যাইত, স্থির হইতে পাইত না।

এ-কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাসবাবু আসিয়া বসিতেন, কতরকম করিয়া বুঝাইতেন, বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিত বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়ীরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল যে, অকস্মাৎ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে তাহার জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও এ ভগ্নপোত কিছুতেই বন্দরে পৌঁছিবে না। শেষ পরিণতি যাহার সমুদ্রগর্ভে, তাহার জন্য হাঁপাইয়া মরিয়া লাভ কি! এমন না হইলে তাহার অমন স্ত্রী জীবনের সূর্যোদয়েই চরণকে রাখিয়া অপসৃত হইত না, এমন অসময়ে কুসুমেরও হয়ত দয়া হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এবং সকলের উপর তাহার মা। এমন মা কে কবে পায়? তিনিও যেন স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন—যাইবার সময় কথাটি পর্যন্ত কহিয়া গেলেন না। এমনি করিয়া তাহার বিপর্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখন বাড়ির পুরাতন দাসী আসিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, দাদা, শেষকালে ছেলেটাকেও কি হারাতে হবে? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকো না আদর কর না, চেয়ে দেখ দেখি, কিরকম হয়ে গেছে।

তাহার কথাগুলো লাঠির মত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া দিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কি হয়েচে চরণের?

দাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বালাই, ষাট! হয়নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাকচেন—

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ধীরপদে চরণ আড়াল হইতে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল—চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে!

দাসী ধমক দিয়া উঠিল—ছিঃ, ও কি কথা দাদা?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেকদিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

দাসী নিজের কাজে চলিয়া গেলে চরণ চুপি চুপি আবেদন করিল, মা'র কাছে যাব বাবা।

সে যে ঠাকুরমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইহাতেই বৃন্দাবন মনে মনে ভারী আরাম বোধ করিল, আদর করিয়া বলিল, তোর মা ত সে বাড়িতে নেই চরণ।

কখন আসবেন তিনি?

সে ত জানিনে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চি।

চরণ খুশী হইল। সেইদিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, চরণকে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দুইদিন বাকী আছে; সকালে বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপে কাজে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইল ভিতরে চরণের ভেদবমি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদবমির চেহারায় বিসূচিকা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনের চোখের সুমুখে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, হাত পা দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, একবার কেশবকে খবর দাও, বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নীচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ঘন্টাখানেক পরে গোপাল ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ছেলেটিকে বাঁচান ! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক, কিন্তু, সে নির্দোষ। অতি শিশু, ডাক্তারবাবু—একবার পায়ের ধূলো দিন, একবার তাকে দেখুন ! তার কষ্ট দেখলে আপনারও মায়া হবে !

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, তখন মনে ছিল না যে, তারিণী মুখুয্যে এই ডাক্তারবাবুরই মামা ? ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান ! সে সময়ে মনে হয়নি, এই পা দুটোই মাথায় ধরতে হবে !

বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলচি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করিনি। যা তাঁকে নিষেধ করেছিলাম—সমস্ত গ্রামের ভালর জন্যই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত জানেন এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায় !

গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, অন্যায় বৈ কি ! মামা ভারী অন্যায় করেচে। আমি ডাক্তার আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু ছত্তর ইংরিজী পড়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছ ! অতবড় পুকুরে দু'খানা খানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয় ! আমি কচি খোকা ! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকা গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা হয় তাই ! নইলে বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ করতে চাও ! এত দর্প ! অত অহঙ্কার ! যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।

ছেলের জন্য বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—ঘাট মানচি, পায়ের ধূলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন ! শিশুর প্রাণ বাঁচান। এক শ টাকা দেব—দু শ' টাকা, পাঁ শ' টাকা—যা চান দেব ডাক্তারবাবু চলুন—ওষুধ দিন।

পাঁচ শ' টাকা !

গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, কি জান বাপু, তা হলে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হতে হবে। এইমাত্র তাঁরাও এসেছিলেন,—না বাপু, তারিণীমামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহার-ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে আমি ডাক্তার, আমার কি ! টাকা নেব, ওষুধ দেব। কিন্তু সে ত হবার জো নেই ! তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে পৈতে দেব কি করে বাপু ! কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু ? তখন তোমাকে নিয়ে ত আমার কাজ চলবে না। বরং এক কাজ কর, ঘোষালমশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও—তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে পায়ে ধর গে, কি জান বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বললেই আমি—আজকাল টাটকা ভাল ভাল ঔষধ এনেচি—দিলেই সেরে যাবে।

বৃন্দাবন বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়া পুনরায় কহিলেন, ভয় নেই ছোকরা যাও দেরি করো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কাজ নেই—যাও, ছুটে যাও।

বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল।

তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিলেন, সন্ধ্যে-আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে। কেমন, —ফলল কি না ! নির্বংশ হলি কি না !

বৃন্দাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া স্বামীকে বলিলেন ছি ছি, এমন অধর্মের কাজ করো না। যা হবার হয়েচে—আহা শিশু, নাবালক—বলে দাও গোপালকে, ওষুধ দিক।

তারিণী খিচাইয়া উঠিল—তুই থাম ! পুরুষমানুষের কথায় কথা ক'স নে।

তিনি থতমত খাইয়া বৃন্দাবনকে বলিলেন, আমি আশীর্বাদ কচ্চি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে, বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন পাগলের মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, না—তবু না।

এমন সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষালমহাশয় পাশের বাড়ি হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খটখট করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এমনি করেই কলিকালে ধর্মকর্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্চে—কেমন হে তারিণী, সেদিন বলিনি তোমাকে, বেন্দা বোষ্টমের ভারী বাড় বেড়েচে। যখন ও আমার কথা মানলে না,

তখনই জানি, ওর উপর বিধি বাম !গ আর রক্ষে নেই ! হাতে হাতে ফল দেখলে তারিণী।

তারিণী মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, আর আমি ! সেদিন পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বলেছিলাম, নির্বংশ হ। খুড়ো, আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে ! এখনও চন্দ্রসূর্য উঠচে, এখনও জোয়ারন-ভাঁটা খেলচে ! বলিয়া ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার স্ব-শরবিদ্ধ ভূপাতিত জন্তুটার মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে, তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তারিণী এই একমাত্র পুত্রশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সর্বাগ্রে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণের দায়ে সে অনেক সাধিয়াছিল, অনেক বলিয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্র-বিয়োগ-বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রম জাগাইয়া দিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল কামনার ফলে এই দুই অধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের তেজে সে নির্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাক্‌বিতন্ডার শেষ-মীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বিগ্ন শান্তমুখে পীড়িত সন্তানের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেশব তখন আগুন জ্বালিয়া চরণের হাতে পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদাঘতপ্ত মরুতৃষ্ণার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত শুনিয়া সে উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়নি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, কলকাতায় চললুম। যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব, না পাই, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্বের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে যায় হে বৃন্দাবন ! চললুম, পার ত ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখ ভাই ! বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কেশব চলিয়া গেলে, পিতাকে কাছে পাইয়া, মার কাছে যাব, বলিয়া ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত কোনদিনই জিদ করিতে জানিত না, কিন্তু আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কাজ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার এবং মায়ের কাছে যাইবার উন্মত্ত চীৎকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল। এই চীৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্নে, যখন হাতে পায়ে পেটে খিল ধরিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

চৈত্রের স্বল্প দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ি ঢুকিল। ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু, ঘরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া একধারে বসিলেন। কেশব সভয়ে তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শান্তভাবে কহিল, হাঁ, আমিই বাপ বটে ; কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই, আপনার যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন। যে বাপ, বারো ঘন্টাকাল বিনা চিসিৎসায় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে পারে, তার সমস্ত সহ্য হয় ডাক্তারবাবু।

পিতার এতবড় ধৈর্যে ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তথাপি ডাক্তার হইলেও সে মানুষ, যে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিল।

বৃন্দাবন বুঝিয়া কহিল, কেশব, এখন আমি চললুম। পাশেই ঠাকুরঘর, আবশ্যক হলে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হবার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন দেখতে পাই, বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ম্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল—যেদিন তাহারা কুঞ্জনাথের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যেদিন কুসুমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়াছিলেন ; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে ঢুকিয়াছে ? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, পাশের ঘরেই আমার চরণ মরিতেছে, ভগবান, অমি সে নালিশ জানাইতে আসি নাই, কিন্তু পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে বাপের চোখের উপর বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে কেন ? পিতৃহৃদয়ে এতটুকু সান্ত্বনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কিজন্য ? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের বহুবার কথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্ত মঙ্গলের নিমিত্ত ! সে মনে মনে বলিল, যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে না তাহাদের কথা তাহারাই জানে, কিন্তু আমি ত নিশ্চয় জানি, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি শুষ্ক পাতাও

মাটিতে পড়ে না ; তাই আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ ? আমার এই অতি ক্ষুদ্র একফোঁটা চরণের মৃত্যুতে সংসারে কাহার কি উপকার সাধিত হইবে ? যদিও সে জানিত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মানবের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, তথাপি, এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিত্ত প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জন্মিল, কেনই বা এত বড় হইল এবং কেনই বা তাহাকে একটি কাজ করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল !

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পদশব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া তখন বৃন্দাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম ঝঞ্ঝা শান্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশের তলে ভবিষ্যৎ-জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন স্ত্রী-মূর্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে অমন আঁধারে আড়ালে বসিয়া আছে !

বৃন্দাবন কাছে সরিয়া আসিয়া একমুহূর্ত ঠাহর করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম। তাহার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল, কুসুম আমার ষোল আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি ? কিন্তু বলিল না।

এইমাত্র সে নাকি তাহার চরণের শিশু-আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নিজের সমস্ত সুখদুঃখ, মান-অভিমান বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী সন্তানের অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিল না, বরং করুণকণ্ঠে বলিল, আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হত। আজ সমস্ত দিন যত যন্ত্রণা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসেছে ! কিন্তু এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল, । দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত দিয়া চরণের অন্তিম শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা। বলিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা কেহই যখন কুসুমের সুমুখে গিয়া ও-কথা বলিতে সাহস করিল না, কুঞ্জনাথ পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন বৃন্দাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে লাভ কি, ছেড়ে দাও, ওরা নিয়ে যাক।

কুসুম মুখ তুলিয়া বলিল, ওদের আসতে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্চি।

তারপর সে যেরূপ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া বৃন্দাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চরণের ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিলম্ব হইল না। কেশব সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—সমস্ত মিছে কথা ! যারা কথায় কথায় বলে—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোচ্চোর !

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, বাড়ি চল।

চল, বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, আজ আমার বাচালতা মাপ করো ভাই। কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপেছিল, এ শাস্তি আমার কেন ? জ্ঞানতঃ এমন কিছু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিনি যে, ভগবান এত বড় দণ্ড আমাকে দিলেন, আমার—

কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই কেশব উদ্ধতভাবে গর্জিয়া উঠিল, জিজ্ঞেস কর গে ওই হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে—সে বলবে, তার জপ-তপের তেজে ; জিজ্ঞেস কর গে আর এক জোচ্চোরকে—সে বলবে, পূর্বজন্মের পাপে—উঃ—এই দেশের ব্রাহ্মণ !

বৃন্দাবন ধীরভাবে বলিল, কেশব, গোখরো সাপের খোলসকে লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুধের ওপর আরোপ করাও ভুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং দ্যাখো।

কেশব সেই-সব কথা স্মবরণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে পুড়িয়া যাইতেছিল, যা মুখে আসিল বলিল, তবে এতবড় দণ্ড কেন ?

বৃন্দাবন কহিল, দণ্ড ত নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়ে না, তখন এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার করে, নিজেকে ছোট করে দেখতে আমি চাইনে। এ জীবনে স্মরণ হয় না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ফল নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরুগৃহ-বাসের গৌরবের ক্লেশ। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলে না কেশব, আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হ'ল, তত বড় শিক্ষা, পুত্রশোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বুক চিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম, আজ পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাঁদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ কর, আজ যা পেয়েছি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট করে বসি।

বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন বৃন্দাবন একটিমাত্র কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্বদিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস ; এ পাড়ায় আর একটা বড়-রকমের কূপ প্রস্তুত না করিলে জলকষ্ট এবং ব্যাধি-পীড়া নিবারিত হইবে না। তাই কেশব ফার্মের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল যে, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলে এমন কূপ নির্মাণ করা যাইতে পারে, যাহাতে শুধু একটা গ্রামের নয়, পাঁচ-সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে ; উপরন্তু, অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ-আবাদেরও সাহায্য চলিতে পারিবে।

বৃন্দাবন খুশী হইয়া সম্মত হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের দিন, দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেস্ট্রী করিয়া কেশবের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, কেশব, এই করো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধুবান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও যখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোনদিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখতে পাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েছে। আমি সেইদিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।

দুর্গাদাসবাবু এ কয়দিন সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে বাবা ! কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক, সহ্য করাই ত মনুষ্যত্ব। অক্ষম অপারগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নহে।

বৃন্দাবন মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সংসার ত্যাগ করার কোন সঙ্কল্প ত আমার নেই মাস্টারমশাই। বরং সে ত একেবারে অসম্ভব। ছেলেদের মুখ না দেখতে পেলে আমি একটা দিনও বাঁচব না। আপনার দয়ায় আমি পণ্ডিতমশাই বলে সকলের পরিচিত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কিন্তু তোমার সর্বস্ব ত জলকষ্ট-মোচনের জন্য দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি করে ?

বৃন্দাবন সলজ্জ হাস্যে দেয়ালে টাঙ্গানো ভিক্ষার ঝুলি দেখাইয়া বলিল, বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টিভিক্ষার অভাব হবে না মাস্টারমশায়, এইতেই আমার বাকী দিনগুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি তারই সঙ্গী-সাথীদের জন্য দিয়ে গেলাম।

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং প্রবীণ হইলেও শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তাই তিনিও কুসুমের যথার্থ পরিচয় জানতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্মরণ করিয়া বলিলেন, সেটা ভাল হবে না বাবা, তোমার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হতেই পারে না বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন মুখ নীচু করিয়া কহিল, তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।

দুর্গাদাস বৃন্দাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্বোপরি এই গৃহত্যাগের সঙ্কল্পে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, জন্মভূমি ত্যাগ করার আবশ্যকতা কি ? এখানে বাস করেও ত পূর্বের মত সমস্ত হতে পারে।

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা ছাড়া, এ বাড়িতে যেদিকেই চোখ পড়ছে, সেইদিকেই তার ছোট হাত-দুখানির চিহ্ন দেখতে পাচ্চি। আমাকে ক্ষমা করুন মাস্টারমশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

দুর্গাদাস বিমর্ষমুখে মৌন রহিলেন।

যে ডাক্তার চরণের শেষ-চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ দেখিবার কৌতূহল ও বৃন্দাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেইদিন সকালে বিনা-আহ্বানে আবার কলিকাতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছিলেন ; বৃন্দাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কেশব কিসের জন্য সমস্ত উন্নতি জলাঞ্জলি দিয়া এই অতি তুচ্ছ পাঠশালায় ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেশব, সত্যই কি তুমি এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে পাঠশালা নিয়ে সারা জীবন থাকবে ?

কেশব সংক্ষেপে কহিল, শিক্ষা দেওয়াই ত আমার ব্যবসা।

ডাক্তার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তা জানি, কিন্তু কলেজের প্রফেসারি এবং এই পাঠশালার পণ্ডিতি কি এক ? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি ?

কেশব সহজভাবে বলিল, সমস্তই। টাকা রোজগার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ।

নয় মানি। কিন্তু এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয় ! উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে রে !

বৃন্দাবন হাসিল এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্বেই কহিল, সে কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তারবাবু, আপনাদের নয় ? আজ আমার দুর্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, এমনি দুর্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নরনারী-হত্যা হয়, সে কি কারো কোনদিন চোখে পড়ে ? আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্মমভাবে ত্যাগ করে চলে না গেলে, আমারা ত এত নিরুপায় হয়ে মরি না ! রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন জোগায়, সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এইসব গ্রামেই বাস। তাদিকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁত্‌লে থেঁত্‌লে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম এ পাস করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েচে।

কেশব আনন্দে উতসাহে বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, বৃন্দাবন, মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে ! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়ে কি না।

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই দুই বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৫ টাকা।

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২